১ম। তাহা হইলে ত সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণই স্বাধীনচিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, কিন্তু কই তাঁহাদিগকে ত কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দেখিতে পাই না ?

২য়। কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির বাহন, সুতরাং বরণীয়। রাজনৈতিক জ্ঞান ও দেশবুদ্ধি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন কংগ্রেস তাঁহাদেরই কর্ম্মক্ষেত্র। শাস্ত্রব্যবসায়ী উচ্চতর তত্ত্বের উপাসক,—তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণকর্ম্মীরই কল্যাণকামী। এরূপ লোকেরও জগতে প্রয়োজন আছে। ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও পণ্ডিতের দল রাজনৈতিক আবর্ত্তের বাহিরে থাকিতেই ভাল বাসেন।

১ম। রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দেশবুদ্ধিরও ত প্রয়োজন আছে ? সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি কাহার দান ?

২য়। হিন্দুর দেশবুদ্ধি কমই ছিল, জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী তাহাকে আটক্ রাখিতে পারে নাই। সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় চিন্তাকরা এবং নরনারী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দর্শন করা ইহাই ছিল হিন্দুর তপস্যা,—তাহার সমাজ, তাহার দিনচর্য্যা সমস্তই তাহাকে এই বিরাট কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিত,—তাহার সাধনে সহায়তা করিত। এ অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে নিজের সমস্ত সহানুভূতিকে আবদ্ধ রাখা যে হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আজিকার ঐ উপেক্ষিত শাস্ত্রব্যবসায়ী হিন্দুর সেই সুমহৎ আদর্শকে এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে বাধা দিলে অন্যায় হইবে। তাঁহারই উদারতীর্থে অবগাহন করিয়া একদিন এই রাজনীতি কলুষিত সংকীর্ণ-জীবনকে মুক্তিদান করিতে হইবে। বিশ্বাসপ্রবণ ভারত শাঠ্যময় জগতের কৌশলজালে পড়িয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল,—জাতীয়তা ভাবমুগ্ধ মুমূর্ষু ভারতের ইংরেজদত্ত বিষ চিকিৎসা,—ভারতের ইহাতে প্রয়োজন ছিল, সুতরাং চিকিৎসককে ধন্যবাদ। কিন্তু বিষ চিকিৎসান্তে বর্জ্জনীয়,—ইহা যে প্রাণান্তকারী হলাহল তাহা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল না হয়। যে দেশবুদ্ধির যূপকাষ্ঠে নরবলি নয়—নরজাতির বলি হইতেছে, তাহার মত ভয়ঙ্কর বস্তু আর কি আছে ?

১ম। স্ত্রীজাতির মুক্তির কথাটীও কি উড়াইয়া দিবার জিনিষ ?

২য়। পুরুষজাতির পূর্ব্বেই স্ত্রীজাতি মুক্তিলাভ করিবে ইহা কি বিশ্বাস্য ? মাতৃত্বই নারীজাতির বৈশিষ্ট্য,—সঙ্গে সঙ্গে মৃদুতা, কোমলতা, রক্ষণশীলতা, মুগ্ধতা ইহাই তাঁহাদের ভাগ্যলিপি। ইহার অন্যথা ঘটাইলে নারীত্ব শূন্য নারীর সৃষ্টি হইবে, এবং তাহাই হইতেছে। পুরুষের অপেক্ষাও অনাবৃত দেহ এবং চপলস্বভাব নারীর সংখ্যা আজ কা'ল কম নহে। ইঁহারা পুরুষের সহধর্ম্মিণী নহেন, প্রতিযোগিনী। স্বর্গের দ্বার একটী নহে, পুরুষ বীর্য্য ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং নারী সেবা ও আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকালকার মুক্তিবাদিনীগণ পুরুষের মতই কোমর বাঁধিয়া যশ ও প্রতিষ্ঠার দ্বার দিয়াই অগ্রসর হইতে চাহেন। মাতা ও বনিতার সুমহৎ কর্ত্তব্যে ইঁহাদের মন ফিরে না, স্বামী পুত্রকে দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও একনিষ্ঠ রাখিয়া ইঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, সীতাসাবিত্রীর আসন ছাড়িয়া তাঁহারা সফ্রাজিষ্টের আসনের জন্য লালায়িত। ইহার নাম কি নারী জাতির মুক্তি ? স্ত্রীজাতির সকলে এই মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিলে সন্তানপালনরূপ গুরুতর দায়িত্ব চাকর চাকরাণীর উপর অর্পিত হইবে,—জাতটা এক পুরুষেই নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বচ্ছন্দ বিচরণের যে মুক্তি তাহা ভারতে অল্পদিনই ব্যাহত হইয়াছে, আজিও বহু স্থানে অব্যাহতই আছে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিচরণ আর যথেচ্ছ বিচরণ এক কথা নহে, নিরস্ত্র পরাধীন জাতির পক্ষে—এ কথা আরও সত্য। কিন্তু এসব বাহিরের কথা,—আদর্শ ভ্রংশই আসল কথা। মুক্তির নামে তাহাই আসিয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডেও স্বচ্ছন্দবিচরণের অতিরিক্ত আর বড় কিছু স্বাধীনতা ছিল না, সফ্রাগেট্ আন্দোলন সে দিনের কথা। দেখা যাউক ইংলণ্ডের জাতীয় অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়। তবে সাহিত্য ও আমোদ-প্রমোদ হইতে যতদূর বুঝা যায় ইংলণ্ডের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে।

১ম। ইংরাজের কল্যাণে অস্পৃশ্যবাদ উঠিয়া যাইতেছে। মাদ্রাজের পারিয়াগণ স্পর্শের ভীতিকর শাসন অপেক্ষা ডায়ারী শাসনকেও ভাল বলিয়া মনে করে।

২য়। লীলাময় যেদিন এক হইতে বহু হইয়াছেন, সেই দিনই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনীচ-বোধের সৃষ্টি। সুতরাং স্পর্শবিচার উঠিবার নয়,—উঠেও নাই,—কেবল উপবীত ও নামাবলী হইতে সরিয়া গিয়া টুপী ও চূড়ীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাই রেলপথে ইউরোপীয়ের গাড়ী এবং সরকারী অফিসে বড়কর্ত্তাদের সিঁড়ি সগর্ব্বে বাজে লোকের বহিষ্কার ঘোষণা করিতেছে। ভারতের স্পর্শবিচার ছিল ধর্ম্মসংস্কার ও শৌচবুদ্ধিমূলক। অনাচার ও অনাচারীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মশুদ্ধির পথ পরিষ্কার করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। তাই একদিকে পশুপক্ষিগণ এবং অপরদিকে পরমাত্মীয়গণ পর্য্যন্ত ইহার শাসন হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের গৌরব-যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চক্ষে সর্ব্বভুক কুক্কুর অপেক্ষা বিশেষভুক বিড়াল, মাংসভোজী শকুনি অপেক্ষা শস্যভোজী শুক, এবং অজ্ঞাতকুলশীলের অন্ন অপেক্ষা মা, স্ত্রী ও সুব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র। অবশ্য আহার্য্য বস্তু মাত্রে যাহাদের প্রয়োজন, তাঁহাদের ঘাতকের অন্নেও বাধিবার কারণ নাই, কিন্তু হিন্দুর বিচার একটু স্বতন্ত্র রকমের। সে বিচারে অবশ্য চলাফেরার কিছু অসুবিধা ঘটায়, কিন্তু হৃদয়সম্পর্ককে মোটেই কলুষিত করে না। সুব্রাহ্মণ প্রাণ খুলিয়া চণ্ডাল প্রতিবেশীর সহিত আলাপ করিবেন, বিপদে তাহার সাহায্য করিবেন প্রয়োজন হইলে নিজেও লইবেন, উচ্চবর্ণের সহিত তাহার বৈষয়িক বিবাদের নিষ্পত্তিকালে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষেই বিচার করিবেন, এমন কি চণ্ডাল সাধুর সমাধিমন্দিরে ভক্তির অঞ্জলি দান করিবেন, কিন্তু কোন মতেই তাহার অন্নজল বা কন্যা গ্রহণ করিবেন না। আজকালকার স্পর্শ বিচার অন্যরূপ,—তাহাতে অন্নজল বা কন্যাগ্রহণে কোন আপত্তিই নাই, যত আপত্তি কেবল শ্রদ্ধাদানে। এ সর্ব্বনেশে অস্পৃশ্যবাদ আমাদের দেশে—অন্ততঃ বাংলায়—কখনও ছিল না। মান্দ্রাজ অঞ্চলে পারিয়ার প্রতি যে সামাজিক অবিচার তাহারও এ ধরণের নহে। সেখানেও পারিয়া সাধুর সমাধি স্থান ব্রাহ্মণের নমস্য,—স্বয়ং হনুমান হয় ত কোন বিস্মৃত যুগের পারিয়া বীর। পারিয়া নীতির কারণ বোধ হয় ঐতিহাসিক। মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তান প্রাধান্যলোপ শঙ্কায় পৌরুষক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে *moral* effect produce করিবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম উপায় ও সংকীর্ণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে,—আজ তাহারই ফলে মদ্রদেশ জর্জ্জরিত হইয়া শেষে ডায়ারী শাসনকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছে। অবিলম্বে এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকার আবশ্যক, কিন্তু কালপ্রতীক্ষা নহিলেও চলিবে না। অসহযোগের আত্মশুদ্ধি সমর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেককে চাই, অথচ যে বিনা চুক্তিতে আসিবে না তাহার এখানে স্থান নাই। সুতরাং আপাততঃ সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থের কথা ভুলিয়া বিনাযুক্তিতে এই সংগ্রামে যোগ দেওয়া আবশ্যক। ভগবৎ কৃপায় বিজয়শ্রী লাভ করিলে ঘরের সমস্ত গোলযোগ অনায়াসেই মিটিতে পারিবে। অবশ্য পারিয়ার শঙ্কার কারণ আছে,—যুদ্ধের সময় এক মূর্ত্তি এবং বিজয় লাভের পর আর এক মূর্ত্তি ইহা বিরল নহে। কিন্তু যুদ্ধটাই যখন আত্মশুদ্ধির, তখন এ সমস্ত শাঠ্যশঙ্কার অবকাশ নাই। আর, পারিয়া প্রাণের জ্বালায় যাহাই বলুন, একথা তাঁহাকে স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ঘরের বিবাদ ঘরে না মিটাইলে মিটিতেই পারে না, বিড়ালের বিবাদে বানর মধ্যস্থতার সুযোগ পাইলে বিবাদ মিটে—কিন্তু সর্ব্বনাশের পর। সর্ব্বনাশের মধ্যে আবার ভীষণতম সেই সর্ব্বনাশ, যাহা সুবিধার ছদ্মবেশে দেখা দেয়। পারিয়া তাহার দুঃখের সংসারে ইংরাজীর বেণোজল আনিয়া দুই একটী উচ্চপদ, এমন কি দুই একটী মেম বিবাহও করিতে পারিবে,—কিন্তু খোয়াইবে যে জিনিষ, তাহার নাম মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালী এই উচ্চাসনের কারবারে দেউলিয়া হইয়া যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা শিক্ষানবীশ পারিয়া ভায়ার নিকট উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নহে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

ইহ ও পরলোক।

স্বপ্ন দেখিলাম, আমরা কাশীধামে যাইলাম ব্রহ্মচারী বালকগণের উচ্চারিত বেদসঙ্গীত শুনিলাম। ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিলাম। আজ বিশ্বনাথ, কাল দুর্গা-বাড়ী, এইরূপভাবে বেড়াইয়া বেড়াইলাম। দেহ ত শয্যায় শয়ান, কে বেড়াইল? চক্ষু ত মুদিত, কে দেখিল? অথচ আমিই বেড়াইলাম, আমিই দেখিলাম। মনোপাধিক জীব মনের দ্বারা দেখাশুনার কার্য্য সমাধা করিল। জাগ্রতে স্থূলেন্দ্রিয়সাহায্যে সকলে দেখে শুনে। স্বপ্নে স্থূলেন্দ্রিয় নাই, কাজেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা একা মনই দর্শন শ্রবণাদির কার্য্য সমাধা করে। স্বপ্নে স্থূলদেহেরই একটি সংস্কারমূলক ছায়া লইয়া মনোপাধিক জীব বিচরণ করে। বলা যাইতে পারে, মনই স্থূলদেহের ছায়া গ্রহণ করিয়া বিশ্বনাথ ক্ষেত্রে বেড়াইয়া আসিল। জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যাবস্থাই স্বপ্ন। মন সম্পূর্ণ আত্মলীন ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিলে সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়না। স্বপ্নে বাহ্যজগতই দৃষ্ট হয়। বাহ্যজগতের খেলাই সেখানে দেখা যায়। জাগ্রতাবস্থার আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত্তিমতা, উপলব্ধি দর্শনসমানাকারা হইয়া ফুটিয়া উঠে। অনুভূতি হিসাবে স্বপ্নাবগতি সত্যই। স্বপ্নাবগতিরিতিই সত্যা (শাঙ্কর ভাষ্য)।

পরলোক স্বপ্নবৎ। মৃত্যুর পর মনোপাধিক জীব স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কার লইয়াই দেহত্যাগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ। লিঙ্গদেহ, ছায়াদেহ ও লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মদেহের বিচরণ স্থানই সূক্ষ্মলোক বা পরলোক। পরলোক ইহলোকেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকেরই বাসনা বা সংস্কার পরলোকে বিদ্যমান। ইহলোকের পাপপুণ্যাত্মিকা বাসনা পরলোকে অনুবর্ত্তমানা, স্থূলদেহে মর্ত্ত্যের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের তথায় ফলভোগ, পরলোক কেবল মনেরই খেলা। ক্ষুধা তৃষ্ণা, তৃপ্তি অতৃপ্তি, সুখদুঃখ সমস্তই সেখানে মানসিক। সে লোকই মানসিক। সে লিঙ্গদেহ মনোধিষ্ঠিত মনোময়। মনোময়ানি তত্র শরীরাণি।

এই পরলোক যাহারা মানেন, তাঁহারাই আস্তিক। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, পরলোক নাই যাহারা বলেন, তাঁহারা নাস্তিক। পুষ্পে গন্ধের মত মৃত্যুতে যদি সব শেষ—তবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড নাই। মৃত্যুর পর ভালমন্দ কার্য্যের কোন ফলাফল নাই। সাধনা, ভগবানে আত্মসমর্পন ব্যর্থ। অমৃতের সন্তান দেহাত্মবাদী পরলোকে অবিশ্বাসী হইয়া অসুররূপে দাড়াইবে। জন্মমৃত্যুর জাল রচনা করা ব্যতীত তাদের আর গতি নাই, থাকিবে না। কি দুঃখ, কি অনাশ্বাস। দেহাত্মবাদী যথেচ্ছাচারীই ত অসুর। "অসূন্ প্রাণান্ রাতি ক্লিশ্নাতি যঃ সোঽসুরঃ"। কঠোপনিষদে যম নচিকেতা সংবাদে যমের উক্তি—"নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে"

মৃত্যুর পর স্থূলদেহের ছায়া লিঙ্গদেহ। স্বর্গ-নরক ভোগোপযোগী ভোগদেহও লিঙ্গদেহ। স্থাবরসংশ্লেষ প্রাপ্ত (জীবাণু-আকার) সূক্ষ্ম জীবদেহও লিঙ্গদেহ। স্থূলদেহের উপর আকর্ষণ

বা অতিরিক্ত ঝোঁকই স্থূলদেহের ছায়াগ্রহণের হেতু। ঐ আকর্ষণ, ঐ ঝোঁক যতই কমিতে আরম্ভ করে, সংস্কারমূলক ছায়াদেহও ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। ক্রমে স্মৃতি-উপস্থাপিত মূর্ত্তির মত সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইয়া যায়। সংস্কারমূলক ছায়াদেহ বিলীন হইলে পর মনোপাধিক জীব জীবাণু আকারে জলে স্থলে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্থাবরাদি পদার্থে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। এই স্থাবরসংশ্লেষ জন্মের দ্বার, জীবের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। সংশ্লেষ অর্থে লাগিয়া থাকা। স্থাবরে শস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট জীবের অবস্থা সংমূর্চ্ছিতবৎ, "সংমূর্চ্ছিতবদবতিষ্ঠন্তে" (শাঙ্কর ভাষ্য)। সে সময়ে অনুভূতি সুখ উপলব্ধি নাই। পানীয় ও খাদ্যের ভিতর দিয়া কত জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে, আবার জন্মিবার অনুকূল অদৃষ্ট না পাইয়া নির্গত হইয়া যাইতেছে। খাদ্যের কুণ্ডনপেষনাদিতে খাদ্যসংশ্লিষ্ট জীবের কোন যাতনা হয় না। আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ছান্দোগ্যভাষ্যে স্পষ্টরূপেই ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। জীবের স্থাবরসংশ্লেষকে * স্থাবরযোনি বা স্থাবরজন্ম বলিয়া কেহ ভাবিবেন না। পাপের ফলে জীবের স্থাবররূপ যোনিতে স্থাবরের কুণ্ডনপেষনাদিতে তৎস্থ জীবের কষ্টের উপলব্ধি হয়। বিষ্ণুপুরাণে সাবিত্রীসংবাদে জীব অঙ্গুষ্ঠাকাররূপে উক্ত হইয়াছে, কঠোপনিষদে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয়দেশ পুণ্ডরীক কর্ণিকাকার বলিয়া তদধিষ্ঠিত আত্মা পুণ্ডরীক আকার বলিয়াই উক্ত আছে।

ছায়াদেহ কোথাও প্রেতদেহ রূপে কথিত। প্রেতদেহ * ভৌতিকযোনি এক জিনিষ নহে। ভৌতিক যোনি জন্ম বিশেষ। যতদিন পরিত্যক্ত স্থূলদেহের উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ বা ঝোঁক, ততদিন ঐ ছায়া বা প্রেতদেহের অস্তিত্ব। স্থূলদেহ যখন আর দেখা যাইবে না পুনঃ প্রাপ্তির আর আশা থাকিবে না, তখন ঐ আকর্ষণ ও ঝোঁক কমিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ মানবাদি জীবের ঐ আকর্ষণ বা ঝোঁক একবৎসর পর্য্যন্ত (কম বা বেশী) স্থায়ী হইয়া থাকে।

"সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে" সংবৎসর মধ্যে বা পরে এই অর্থ করিলেই একবাক্যতা হয়। সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তিরাই একবৎসর মধ্যে বা পরেই স্থূলদেহ গ্রহণ করে।

স্থূলদেহের ছায়াই প্রেতদেহে বর্ত্তমান। এইজন্য প্রেতদেহের নামই ছায়াদেহ। মৃত্যুর পর ঐ ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ গৃহীত হইয়া থাকে। ছায়া বা প্রেতদেহ কেবল মানবদের জন্যই, আতিবাহিক দেহ (যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত দশপিণ্ড দ্বারা নাশ্য) ছায়াদেহেরই অসংস্কৃত পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। উহাও মানবেরই প্রাপ্য।

"কেবলং মনুষ্যানাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ" যোগবাশিষ্ঠে পশুপক্ষীদের সম্বন্ধেও আতিবাহিক দেহ গ্রহণের কথা আছে।

যোগীর যোগশক্তিলভ্য যোগদেহ, মহাত্মাদের অলৌকিক শক্তিজাত চিন্ময়দেহ, ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ নহে। জীবদ্দশায় প্রগাঢ় চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতে পারে। প্রিয়জনের বা আপনার চিন্তামূর্ত্তি কখন কখন দৃষ্ট হইয়াছে, এমন কথাও শুনা যায়। প্রগাঢ় ভাবনাপ্রকর্ষে

---

*বিস্তারিত পরে বুঝাইব)

* ভৌতিক যোনি সম্বন্ধে পরে বুঝাইব।

স্মৃতি প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে—ইহা আচার্য্য রামানুজের মত। ধ্যান বা নিদিধ্যাসন যে সাক্ষাৎকাররূপে পরিণত হইয়া থাকে—ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

ছায়াদেহ সাধারণতঃ সাধারণ পাপপুণ্যকারী মানবেরাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাপ্তি মাত্রেরই বিলয় আছে। ছায়াদেহের প্রাপ্তি ও বিলয় দুইই স্বভাবের কার্য্য। বাধা না পাইলে স্বভাবের কার্য্য আপনা আপনি সুশৃঙ্খলায় হইয়া থাকে। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেও সাধনার নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। মৃত আত্মার সদ্গতিকারণ কল্যাণময়ী প্রক্রিয়া আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৃতআত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আমাদের শ্রাদ্ধতর্পণাদি উন্নত প্রণালার আধ্যাত্মিক চিকিৎসা স্বাভাবিক নিয়মে রোগ আরোগ্য হয়, তথাপি চিকিৎসার প্রামাণ্য।

মুক্তব্যক্তি ও শিশুদের এই দেহলাভ ঘটে না (মুক্তদের সম্বন্ধে পরে বলিব)। যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক, এক বৎসরের কি দুইবৎসরের কম কোন শিশুরই “আমার দেহ ইত্যাকার” এইরূপ সংস্কার থাকা সম্ভবই নহে. কাজেই স্থূলদেহের উপর তাহাদের কোন আকর্ষণই জন্মে না। শিশুরা মৃত্যুকালে স্থূলদেহের ছায়া লইয়া যাইতে পারে না বলিয়া একেবারেই জীবাণুআকার প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরসংশ্লেষ লাভ করে। আর তদ্ভিন্ন বর্ত্তমানজন্মে কোনরূপ পাপপুণ্য করিয়া যায় না বলিয়া, স্বকর্ম্মার্জ্জিত কোন বিশিষ্ট গতির অধিকারী তাহারা হয় না। স্বানুরূপ দেহলাভের অপেক্ষা করা, কি আশ্বাস পাওয়া তাহাদের অদৃষ্টে নাই। মৃত্যুর পরই সংমূর্চ্ছিত জীবাণুআকার প্রাপ্তি। তজ্জন্যই শিশুদের পক্ষে দাহ বা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই। সংস্কারমূলক ছায়াদেহ গ্রহণের তাহাদের যোগ্যতা বা শক্তি থাকেনা, আতিবাহিক দেহ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয় না, পারলৌকিককার্য্য পুণ্য বা অত্যুৎকট পাপ না থাকায়, স্বর্গ নরক ভোগ প্রাপক ভোগদেহ লাভও তাহারা করিতে বাধ্য হয় না, কাজেই দাহে এবং শ্রাদ্ধ তর্পণে, সেই শিশুদের কোন উপকারই নাই। জলৌকার মত স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াই অপর স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়—ইহা শিশুদের বেলায়ও খাটে না। কারণ শস্যাদিতে সংশ্লেষ, রসরক্তরূপে পরিণতি তার পর গর্ভবাস ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপ হইবেই। আচার্য্য শঙ্কর জলৌকাদৃষ্টান্তের অন্তরূপ অর্থই করিয়া গিয়াছেন।

স্থূলদেহের উপর আকর্ষণই বড় আকর্ষণ। শবদেহ দাহান্তে আকর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে। সে দেহ পাইবার আশাও থাকে না। তবে অতীত বা বিনষ্ট বস্তুরও উপর ও ত আকর্ষণ লোপ পায় না। আত্মহত্যাকারীরা এমন অনৈসর্গিক উৎকটভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তাহাদের স্বাভাবিক নিয়মে প্রেতদেহ বিমুক্তি ত ঘটেই না, উপরন্তু সন্তানাদির ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তি সহকৃত শ্রাদ্ধাদির কোন উপকার ও তাহারা পায় না। বহুকালে বহুকষ্ট ভোগের পর আত্মহত্যাকারী স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়। রঘুনন্দন আত্মহত্যাকারী সম্বন্ধে দাহশ্রাদ্ধাদির কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তবে প্রাচীন সংহিতায় একটি প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে। তাহা অতি কঠোর কিন্তু তদ্দ্বারা দেহীর উপকার হইতে পারে। সন্তানাদি তাহা না করিলে কোনরূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন না। “নারায়ণ বলি,” “বলিবধপ্রায়শ্চিত্ত” দুই স্থানে হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি শুনিয়াছি।

কোন মুক্তব্যক্তির শবদেহ যদি স্ফটিকময় পাত্রে আবদ্ধ করিয়া উন্মুক্তস্থানে রক্ষা করা

যায়, তবে উক্ত দেহীর গতির ব্যাঘাত ও উদ্ধারের বিলম্ব ঘটে। ফটোও মৃত আত্মার বড় আকর্ষণের জিনিষ বলিয়া সাধারণ ব্যক্তির ফটো চিত্র প্রভৃতি রাখা সমীচীন নহে। খ্যাতনামা শিশিরকুমার ঘোষ মৃতপুত্রের ফটো তুলিবার জন্য আমেরিকায় প্রেততত্ত্ববিদের নিকট লিখিয়া পাঠান। বাল্যকালের ফটো থাকিলে মৃত আত্মাকে সহজে আনা যাইবে বলিয়া সেই প্রেততত্ত্ববিদ্ পুত্রটির শৈশব বয়সেরও কোন ফটো আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন।

শিশুদের কথাই হইতেছিল। যে শিশুরা বাল্যেই দেহত্যাগ করে—তাহারা দ্বিবিধ শ্রেণীর। এক, পুণ্যাত্মা দেবশিশু। আর, ক্ষুদ্রকর্ম্মা তৃতীয়জন্তু। মুক্ত মহাত্মারা কখন কখন শেষ একবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্যই সংসারে আসেন। বসুদের গঙ্গাগর্ভে জন্মমাত্র মৃত্যু, দেবকীর ছয়টি সন্তানেরই কংসহস্তে নাশ দেবশিশু স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। উহারা স্বাভাবিক দেবতা। ক্ষুদ্রকর্ম্মা মোহমুগ্ধ অজ্ঞ জীব জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্য শিশুরূপে জন্মিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারাই তৃতীয়জন্তুর উদাহরণ। শ্রুতি প্রমাণ—

'অসকৃদবির্ত্তানি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং।'

কেবল যেবার উক্ত শিশু শিশুঅবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না—বুঝিতে হইবে, তখন আর তাহার প্রারব্ধ (ফলোন্মুখ কর্ম্মফল) নাই। প্রারব্ধ না থাকায় সে জীব কেবল নূতন ক্রিয়মান কর্ম্মই করিয়া যাইবে। সামান্য অফলোন্মুখ সঞ্চিত কর্ম্মফল কিছু সঙ্গে আনিতে পারে, এইমাত্র। সঞ্চিত একেবারেই যাহারা না আনে, তাহারা আবার গোড়া হইতে ভবের খেলা আরম্ভ করে। পাপপুণ্যের খাতায় তাহাদের জমা খরচ কিছুই নাই। জৈবাবাসনা সংস্কার ও প্রকৃতির বশে জন্মের হাত তাহারা এড়াইতে পারে না। ক্রিয়মানকর্ম্মের উপর মানবের স্বাধীনতা আছে বলিয়া সেই নূতন ক্রিয়মান কর্ম্মই আবার নূতন করিয়া (অদৃষ্টও) প্রারব্ধ তৈয়ার করিবে। সেই প্রারব্ধ এ জন্মে ফলভোগ সম্ভব হইলে এই জন্মে ফল দিবে, নচেৎ জন্মান্তরে অনুবর্ত্তন করিবে; ইহজন্মের কর্ম্মফলের বল অধিক হইলে এইজন্মেই তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে।

"অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে "

আচার্য্য শঙ্করের মতে ক্রিয়মান কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা আছেই। অংশতঃ জন্মান্তরীন প্রকৃতির অধীন হইলে প্রধানতঃ উহা স্বাধীনই। বর্ত্তমান জন্মের প্রারব্ধ পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়মান কর্ম্মেরই ফল। একজন্মে কৃত না হইলে প্রারব্ধ ত আর আকাশ হইতে নামিবে না। পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতির বলেই মানব কর্ম্ম করে—ইহা মানিলে উন্নতি অবনতিতে মানবের কোনও অধিকার নাই, ইহা মানিতে হয়। একবার মানব যে ভাবের, যে জাতীয় পাপ বা পুণ্য করিয়া আসিবে, তাহা হইলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবের, সেই জাতীয় পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। একজন্মে কেবল স্বাধীনতা মানিয়া বাকী শত শত জন্মে স্বাধীনতা না মানা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। কস্মিন্‌কালে আর পরিবর্ত্তন নাই, আশ্চর্য্য। নরজন্ম শ্রেষ্ঠজন্ম—কারণ ঐ জন্মে মানবের কর্ম্মস্বাধীনতা আছে পশ্বাদি জন্ম নিকৃষ্ট—কারণ ঐসকল জন্মে কর্ম্মস্বাধীনতা নাই। শিক্ষা, সংসর্গ, সাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম ও ভগবানে ভক্তি সকলই বৃথা। এ মত মানিলে বিশ্বের খেলাই হয় না, লীলার বিচিত্রতা থাকে না, সৃষ্টির মাধুর্য্যই নষ্ট হয়।

প্রারব্ধে মানব পরাধীন। কারণ, যে ফলোন্মুখ কর্ম্মফল বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক—তাহা ভোগ করিতে হইবেই। অফলোন্মুখ সঞ্চিতাখ্য পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে মানব পরাধীন ও স্বাধীন। সাধনায় সঞ্চিত পাপ কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অত্যাচারে উহা বৃদ্ধি লাভ করে। সঞ্চিতপুণ্য জন্মান্তরের আরম্ভক না হইলেও উহার ভোগ জন্মান্তরে হইয়া থাকে, পাপে নষ্ট হইতেও পারে, সঞ্চিত কর্ম্মফল অন্তঃকরণে সূক্ষ্মভাবে সংস্কাররূপে জড়াইয়া থাকে। বর্ত্তমান জন্মে যে নূতন কর্ম্ম কৃত হইবে—উহারই নাম ক্রিয়মান। ক্রিয়মান কর্ম্মে সামান্যমাত্রই অধীনতা আছে; জন্মান্তরীণ প্রকৃতির বশে একটি ভাল মন্দ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জাগে; আর সেই ইচ্ছার বশেও কখন কখন মানব যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে মানবের জোর সাধনা ফলবতী হইতে পারে, ওই ইচ্ছার প্রসার ও সঙ্কোচে মানবের হাত আছে, ইচ্ছা না থাকিলেও নতন ইচ্ছার উদয়েও প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার দেওয়া আছে। কেবল মাত্র বর্ত্তমানজন্মের স্বাধীনভাবেও মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে। অনেক কার্য্যই মানবে নূতন জন্মে করিয়াও যায়। মানব মনে করিলে দেবতা ও পিশাচ হইতে পারে। আমরা অগাধ অর্থ সত্ত্বেও দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন করি না। আমরা মনে করিলে ভাল কার্য্য করিতে পারি, মন্দ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বকই সে যত্ন লই না। আমাদের শত চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়—তখন না হয় বলিব জন্মান্তরীণ প্রকৃতি আমাদের চেষ্টার প্রতিকূলে ছিল।

শিশুদের প্রস্তাব চলিতেছিল। মনেকর, কোন শিশু জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া তাহার প্রারব্ধ শেষ করিয়া আসিল, সঞ্চিতও রহিল না, তবে সে ব্যক্তি মুক্ত হইবে না কেন? কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সে ত বাসনার উচ্ছেদ, সংস্কারের নাশ এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া যাইতে পারে নাই—তাহারা মুক্ত হইবে কেন? কেহ কেহ পাপপুণ্যের কোন জমা খরচ না লইয়া গোড়া হইতে একেবারে ১ম পয়েণ্টে স্তরে থাকিয়াই নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করে, করিবার পূর্ব্বে অবশিষ্ট কর্ম্মফল শেষ করিবার জন্য দুই একবার হয়ত শিশু জন্মে জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া গিয়া থাকে। এ মৃত্যুতে পাপক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর কিছুই হয় না।

শিশুগণের শৈশবে মৃত্যু সর্ব্বত্রই যে পাপসূচক তাহা নহে, তবে সেই শিশুর আর সে জন্মে কোন কর্ম্মফল সঞ্চয় হইল না। শিশুরা শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অনেক সময়ে সেই গৃহে একই মাতার কোলে আসিয়া থাকে। অতি শৈশবে মৃত্যু হয় বলিয়া সে জন্মের কোন কর্ম্মফল না থাকায় তাহাদের ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। মাতা পিতা প্রভৃতি প্রিয়জন শিশুসম্বন্ধে যে আকাঙ্ক্ষা করেন, সে আকাঙ্ক্ষার কোনরূপ বাধা শিশুর তরফ হইতে জন্মে না। বয়স্ক ব্যক্তির বেলায় এই নিয়ম খাটে না। কারণ পাপপুণ্য তাহাদিগকে যে মৃত্যুর পর কি অবস্থায় উপনীত করাইবে তাহার ঠিক নাই। পাপপুণ্যের বৈচিত্র্যই ইচ্ছামত কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়, প্রিয়জনের আকাঙ্ক্ষা সফল করে না। শিশু অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহারা প্রায়ই জন্মান্তরে মানব হইয়াই জন্ম লাভ করে।

এক গৃহে জন্মিলেও শিশুদের জন্মান্তরস্মৃতি ফুটে না। শিশুকাল হইতে একই ঘরবাড়ী একই আত্মীয়স্বজন দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের বলিয়া সংশয়ই জন্মে না। বর্ত্তমান জন্মেরই ধারণা জন্মে। কোন বয়স্কব্যক্তি জ্ঞান সঞ্চারের পর পূর্ব্ব জন্মের পরিচিত স্থান এবং প্রিয়জনকে যদি

দেখিতে পায়—তাহা হইলেই ফুটিয়া উঠিবে। এইজন্মে আমি কোন স্থানে আসি নাই; অথচ দেখিয়াছি বলিয়া বেশ মনে পড়িতেছে—সেইরূপ ক্ষেত্রেই জন্মান্তরস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্বোধের কারণ সামগ্রী উপস্থিত হইলে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট জন্মান্তরীণ স্মৃতি ফুটিয়া উঠে। জন্মান্তরস্মৃতি যে স্পষ্ট অস্পষ্ট ফুটে না—তার একমাত্র কারণ উদ্বোধক সামগ্রীর অভাব, কালিদাসও এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা নূন স্মরত্যবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি

সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তি মৃত্যুর একবৎসর মধ্যে বা ঠিক পরেই সাধারণতঃ জন্ম গ্রহণ করে। প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইলেই জীবের স্বস্তিবোধ হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক নিমেষের জন্যও মূর্চ্ছা আসিয়া অধিকার করে। আর সেই অবসরে মূর্চ্ছার অন্তরালে জীবের মৃত্যু ঘটে। কোন জীব আমি দেহ হইতে বাহির হইতেছি বা আমার প্রাণ বা আত্মা বাহির হইল এরূপ জানিতে পারে না। মৃত্যুর পর দেহী স্বস্তি বোধ করিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়. লঘুদেহ দেখিয়া "সে ভারী দেহ কোথায় গেল" ভাবিয়া কেহ কেহ মৃত্যুস্থানে ফিরিয়া আইসে। দেহ ভস্মীভূত, পুনঃপ্রাপ্তির কোন আশা নাই—কাজেই ঝোঁকও কমিয়া গেল। কেহ দুই একদিন সেই স্থানে আসা যাওয়া করিয়া, কোন ফল না পাইয়া দেহের উপর ত্যক্তরাগ হইল। প্রিয়জনের সহিত দেখা শুনায় কোন তৃপ্তি নাই, কোন লাভ নাই দেখিয়া তাহাও ছাড়িয়া দিল। কেহ বা দুই একদিন তৃপ্তি পাইয়াও শেষে বাধ্য হইয়াই অবশ্যম্ভাবী গতিলাভের জন্য সে স্থানের মায়া ত্যাগ করিল। আবার, সকলের শক্তি বা যোগ্যতাও থাকে না।

অধিকাংশ দেহীকেই নিজ নিজ পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বশে চলিতে হয়। স্থূলদেহের আশাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া সেই জীব উন্মত্তের মত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে না। নিজের ঝোঁকেই পাগল। স্থূলদেহ লাভের উপায় করিতে পারে না, অথচ সেই অনির্দ্দিষ্ট সন্ধানেই জীবকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দেহের ছায়াও ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, শেষ সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইয়া যায়। এমনই জীব তখন স্থাবরসংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া জন্মের অপেক্ষায় থাকে (উন্মুক্ত স্থানে খোলা জায়গায় বিশেষতঃ নদীতীরে মৃত্যুতে দেহীর কিছু কিছু উপকার হয়। আমাদের শাস্ত্রমতে গঙ্গাতীরে মৃত্যুতে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে)।

ছায়া দেহে অবস্থিতি কালে পাপপুণ্যের ফলভোগ হয় না। কেবল পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বলে মোটামুটী ক্ষুধা তৃষ্ণা, স্বস্তি ক্লান্তি, তৃপ্তি অতৃপ্তি আর তজ্জনিত সুখদুঃখের উপলব্ধি দেখা যায়। সে উপলব্ধিতে পাপপুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এ অবস্থা হাজতবাসের মত। জীবদ্দশার অভ্যস্ত সংস্কার জন্যই ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি ভাব জন্মে। "পাইলাম" এই সংস্কার জন্মিলেই তৃপ্তি ও সুখবোধ, আর পাইলাম এই সংস্কার না জন্মিলেই অতৃপ্তি ও দুঃখ-

বোধ। আপনা আপনিই এই সংস্কারের উদয়, আবার আপনা আপনিই বিলয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তবে আপনা আপনি বিলয় না হইলে তাহার উপায়বিধান করা যায় কি না দেখিতে হয়। আমরা "দিলাম" এই সংস্কার উৎপাদন করাইতে পারিলে মৃত জীবের তৃপ্তি ও সুখ-বিধান করিতে পারি। মৃত আত্মার সদ্গতি ও মঙ্গলের জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমরা প্রার্থনা করি, উপরন্তু সম্মুখে অন্নজলাদি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য রাখিয়া মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে শুভসংস্কার উৎপাদনে যত্ন লই। মৃত জীব শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি দ্বারা তৃপ্ত হন। পিতৃপুরুষের ভোজনই দৃষ্টিমূলক, দেবতাদের অমৃতভোজনের মত।"

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি দৃষ্ট্বৈব অমৃতেন তৃপ্যন্তি।"

মাতার ঐকান্তিক ডাকে যখন সন্তানের রোগ সারে, সতীর হত্যা দেওয়ায় পতি মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া যায়, তখন সন্তানের প্রার্থনা ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তিসংযুক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতজীবের উপকার হইতে না পারিবে কেন? এক বৎসর মধ্যে জন্ম না হইলে সপিণ্ডকরণ দ্বারা কোন বাধা যদি থাকে ত দূর হইয়া থাকে। শুভ সংস্কার উৎপাদন করা, বাধা দূর করা, সদ্গতির উপায় করা বা অন্যবিধ মঙ্গলবিধান করা শ্রাদ্ধাদির উদ্দেশ্য। শ্রাদ্ধাদি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা।

"সংবৎসরে দেহমতো হতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে"

অত্যুৎকট পাপাচারী আর পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তি সংবৎসর মধ্যে বা ঠিক পরেই জন্মগ্রহণ না করিয়া পাপপুণ্য ফলভোগার্থ স্বর্গে বা নরকে গমন করে।

"তত স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা"

স্বর্গ নরক ভোগোপযোগী দেহের নাম ভোগদেহ। ছায়াদেহে বা প্রেতদেহে সূক্ষ্ম জীবাণুশরীরে স্বর্গনরকভোগ বা পাপপুণ্য ফলভোগ হয় না। স্বর্গে পুণ্য ক্ষয়, নরকে পাপ ফল উপভুক্ত হইলে জীব স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ম্মার্জ্জিত জন্ম লাভ করে, "যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবঃ"

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ" (কঠোপনিষৎ)

মানসিক সুখভোগের স্থানই স্বর্গ, মানস দুঃখভোগের ক্ষেত্র নরক। স্বপ্নের মত সে ভোগ কেবল সংস্কারমূলক। স্বপ্নের ভোগ যেমন স্বপ্নকালে সত্যরূপে প্রতীত, পারলৌকিক ভোগও পরলোকে বাস্তবরূপেই প্রতীত। "স্বপ্নাবগতিই সত্য" (শাঙ্করভাষ্য), স্বপ্ন কাল্পনিক হউক, স্বপ্নোপলব্ধি সত্যই! স্বাপ্নজ সুখদুঃখ এবং পারলৌকিক সুখদুঃখের সহিত বস্তুর সুখদুঃখের অনুভূতি হিসাবে কোন তারতম্য নাই। পরলোকের সুখদুঃখের অনুভূতি হিসাবে কোন তারতম্য নাই। পরলোকের সুখদুঃখের বিচার মর্ত্ত্যে বসিয়া করা চলে না। স্থূল-দেহের সুখদুঃখের বিচার যদি মুক্তি অবস্থায় লোকে বিচার করেন, তবে সে বিচার কি মানিয়া থাকি? মুখে মানা এক, মনেপ্রাণে মানা আর। আমরা মর্ত্ত্যের মধ্যে থাকিয়া যদি পারলৌকিক সুখদুঃখ মিথ্যা বলি, তাহা হইলে মুক্তিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমাদের পার্থিব সুখ-দুঃখভোগকে মিথ্যা বলিলে প্রতিবাদ করা চলে কি?

পরলোক ভোগপ্রাপক পুণ্য পারলৌকিকার্থ, ইহলোক-ভোগ্য পুণ্যের নাম ঐহিকার্থ। পুণ্যের বল, অধিক হইলে ইহজন্মেই তার ভোগ হয়, নচেৎ জন্মান্তরে অনুবর্ত্তন করে। পরলোক

মান বা নাই মান, পরলোক কামনা করিয়া কিছু কর বা নাই কর—পারলৌকিকার্থ পুণ্য অনুষ্ঠিত হইলেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। অত্যুৎকট পাপের ফল এই জন্মেই ভোগ হয়। এই জন্মে বা পর জন্মে যাহা ভোগ হইতে পারে না, তাহাই নরকে ভোগ হয়। (বিস্তৃত বিচার পরে করিব)।

কেহ যদি ভূখণ্ডে, পৃথিবীতলে অপূর্ব্ব, সুখ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তদনুরূপ সাধনা করিয়া যায়, তবে সে সুখের ভোগ মর্ত্ত্যে স্থূলদেহে হইবে কিরূপে? মানসিক ভোগ ব্যতীত সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে কোথায়? কেহ যদি আকাঙ্ক্ষা করে আমি পাখীর মত আকাশে আকাশে উড়িব, মৎস্যের মত জলে ভাসিয়া বেড়াইব, চিরজীবিত থাকিয়া চিরযৌবন পাইয়া জরারোগবিবর্জ্জিত হইয়া ইচ্ছামত সুখভোগ করিব, চিরযৌবনা আদর্শ সুন্দরী সঙ্গে অবসাদহীন ক্লান্তিশূন্য উপভোগ করিয়া যাইব। তবে তাহার সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণ, এ ভাবে বাসনা পরিতৃপ্ত মর্ত্ত্যে স্থূলদেহে সম্ভবই নহে, মৃত্যুর পর মনোময় ভোগ ব্যতীত এ আদর্শ ভোগতৃষ্ণা কোথাও মিটিবার সম্ভাবনা নাই। জীবদ্দশার পুণ্যসাধনাই স্বর্গে ফলবতী হইয়া উঠে, মর্ত্ত্যের বাসনাই তথায় মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। "স্বর্গলোকে মনোময়াণি শরীরাণি"।

স্বর্গলোক সংকল্পমূলক। সংকল্পমলাস্তত্র লোকাঃ। এই কারণে দেখ, স্বর্গবর্ণনায় চিরযৌবনা অপ্সরা অবসাদহীন ভোগ, সংকল্পমাত্র ইচ্ছাপূরণ, জরারোগরাহিত্য চির বসন্ত, নিত্যজ্যোৎস্না প্রভৃতি বিদ্যমান। অবশ্য ইহা ভোগ স্বর্গ। ভোগস্বর্গ ব্যতীত অন্যবিধ স্বর্গও বিদ্যমান।

কেবল জ্ঞানরহিত কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" হইতে প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। জ্ঞান সহিত কর্ম্মের দ্বারা দেবলোক "বিদ্যয়া দেবলোকঃ", দেবলোক হইতে কদাচিৎ ব্রহ্মলোক গমন হইয়া থাকে। বেদান্তমতে সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তথায় দহরাদি উপাসনাদিদ্বারা ক্রমমুক্তিলাভে অধিকারী হন।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে,
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পর পদং"

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই কৃতাত্মা সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করিবেন—ইহাই বেদান্তমতে ক্রমমুক্তি। আসল মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি। নির্ব্বাণ মুক্তিতে "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" "ন প্রাণাঃ উৎক্রমন্তি"। প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ জীব (মনোপাধিক আত্মা) দেহ হইতে (উৎক্রান্ত) উদ্গত হয় না। বাসনার ক্ষয়ে মনের লয়। মনের লয়ে জীবের জীবত্বের প্রবিলয়। ফলে জীবাত্মার স্বরূপে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি। "ব্রহ্মৈব ভবতি"।

যতদিন পুণ্যফল স্বর্গে বাস ও ততদিন। পুণ্যক্ষয়ে পতনের কাল উপস্থিত হইলে, স্বর্গের উপর জীবের মোহ ছুটিয়া যায়। মর্ত্ত্যে আসিবার নূতন ইচ্ছা জাগে। পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিল অথচ মোহ কিছু মাত্র কমিল না—এ অবস্থা কত কষ্টের! অত কাল ধরিয়া স্বর্গে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করিয়া আসিয়া আবার পৃথিবীর দুঃখশোকভূয়িষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করাই ত এক প্রকার নরক ভোগ বলিয়া বোধ হইবে। তবে লোকে স্বর্গ চাহিবে কেন,? স্বর্গ ভোগের পর পৃথিবীতে আসার চতুর্গুণ কষ্টের কথা ভাবিয়া কেহই স্বর্গকে স্পৃহণীয় বলিয়া ভাবিবে না। কিছুদিন রাজভোগের পর মুটিয়ার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসার মত "স্বর্গভ্রষ্ট জীবের

ফিরিয়া আসা মর্ম্মান্তিক কষ্টেরই কারণ হইবে। স্বর্গভোগোপযোগী পুণ্যের ক্ষয় হইবে, আর সেই সঙ্গে স্বর্গভোগের উপর একটি বিষম অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিবে। বহুকাল দুঃখ নাই, দুঃখের স্মৃতি পর্য্যন্ত মনে নাই—কাজেই সে বাহ্যভোগ আর মধুর ও তৃপ্তিপ্রদ লাগিবে না। স্বর্গ তখন সুবর্ণপিঞ্জর, ভোগ তখন পণ্যক্রীত, অপ্সরা তখন হৃদয়হীনা ক্রীতদাসীরূপে দেখা দিবে। স্বর্গ আর তখন স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে না। পৃথিবীই তখন নূতন এবং স্পৃহনীয় ঠেকিবে। স্বর্গের কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া পরাধীনভাবে সুমিষ্ট পুণ্যফল খাওয়ার চেয়ে মর্ত্ত্যে স্বাধীনভাবে সুখদুঃখময় পুণ্যপাপফল খাওয়াই ভাল লাগিবে। হৃদয়হীনা অপ্সরার পণ্যক্রীত সেবা অপেক্ষা প্রেমময়ী মর্ত্ত্যস্ত্রীর আদরের সঙ্গ স্পৃহনীয় মনে হইবে। স্বর্গভোগের আকর্ষণ যেমন ক্ষয় পাইবার অবস্থায় আসিবে, অমনই মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। ক্ষয়ও হইবে, ভোগদেহও বিলীন হইয়া যাইবে। পৃথিবীর শক্তি স্বর্গভ্রষ্টকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবে। তার পর বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিধারার সহিত সেই স্বর্গভ্রষ্ট জীব স্থাবরাদিতে সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া শুভ জন্মের অপেক্ষা করিবে। পর্ব্বত হইতে পতনের সময়ে যেমন জ্ঞান থাকে না, স্বর্গচ্যুতির পরও জীবের কোন উপলব্ধি থাকে না।

যাবৎ সংপাতমুষিত্বা (যাবত পুণ্যফলং স্বর্গে স্থিত্বা) অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে, যথেতমাকাশং আকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বা অভ্রং ভবতি। অভ্র ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্তে, অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং, যো রেত সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব তদাকার এব ভবতি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

পারলৌকিকার্থ পুণ্যাচারী ধার্ম্মিকগণের ঐহিকার্থ পুণ্যের ফলে নূতন উৎকৃষ্ট কুলে শুভ জন্ম লাভই ঘটে। ইহলোকে যে পুণ্যের ফল ভোগ না হয়, তাহাই জন্মান্তরে ভোগ হইয়া থাকে। আবার যে পুণ্যফল ইহলোকে জন্মান্তরে স্থূলদেহে মর্ত্ত্যে ভোগ হইতে পারে না, তাহাই পরলোকে স্বর্গে মানসিক ভোগ করিতে হয়। আর পুণ্যক্ষয়ান্তে বহুকাল বাহ্যসুখ ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মন পরিশ্রান্ত হইয়া উঠে। স্বর্গভোগ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া শেষে অতৃপ্তির কারণ থাকে। তখনই পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা জাগে। ইহা ভগবানের করুণা।

কোন কোন মতে স্বর্গে পুণ্যের নিঃশেষে ক্ষয়ই হয় না, তৈলাবশেষের মত অবশেষ থাকিয়া যায়। সেই অবশিষ্ট পুণ্যের ফলেই স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তির উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়। দ্রব তৈলাবশেষ পাত্রে লাগিয়া থাকা সম্ভব বলিয়া থাকে, পুণ্যের অবশেষ সেরূপ ভাবে থাকিবার হেতু নাই বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর এ মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

মহাভারত মঞ্জরী।

সপ্তম অধ্যায়—প্রথমবার পাশাখেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইয়াছে। সকলেই গৃহে গিয়াছেন। কেবল রাজা দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া সভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। যতই দেখিতেছেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঈর্ষা হইতেছে। একদিন রাজা দুর্যোধন সভা দেখিতে দেখিতে স্ফটিকের কৃত্রিম জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাতে জল আছে ভাবিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন করিলেন। শেষে বুঝিলেন, তাহা জল নহে। তখন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আর এক দিন আর এক সরোবরে স্বচ্ছ জল দেখিয়া, তাহাও স্ফটিক ভাবিয়া যেমন নামিলেন, বস্ত্র ভিজিয়া গেল। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবগণের ভৃত্যেরা হাসিয়া উঠিল। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবও হাসিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন। অতি অভিমানী রাজা দুর্যোধন মরমে মরিয়া গেলেন। আবার সেই সভাগৃহের একস্থানে বৃহৎ দর্পণ দণ্ডায়মান ছিল। রাজা দুর্যোধন তাহা দ্বার ভাবিয়া যেমন গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মস্তকে আঘাত পাইলেন। তিনি একে ত পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞ ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন তাহার উপর এত লাঞ্ছনা, এত বিড়ম্বনায় ঘৃতাহুতি অনলের ন্যায় ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিলেন। *

শেষে রাজা দুর্যোধন মাতুল শকুনির সহিত হস্তিনায় চলিলেন। পথে মাতুলকে বলিলেন, "হতভাগা পাণ্ডবেরা একদিন আমার ভয়ে দীনহীন ভাবে, বনে বনে বিচরণ করিয়াছে, আর আজ তাহারা সমুদয় ভারতের সম্রাট হইল! ভাবিয়াছিলাম, এই রাজসূয় যজ্ঞেই যুদ্ধ বাধিবে, আর তাহাতেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছে। আমি তাহাদের সভা দেখিতে গিয়া যেরূপ লজ্জিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াছি, তাহা ত জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। তাই ভাবিতেছি, ভীষ্মদেবাদির সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিব। তাহা হইলেই তাহাদের সভা, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, সকলই অনায়াসে পাইব।"

শকুনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে যুদ্ধে পরাজিত করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা অজেয়।। তবে রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলিতে ভাল বাসেন, অথচ খেলিতে জানেন না। তুমি তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পাশা খেলিতে আহ্বান কর। আমি তাঁহাকে কপটাচরণ দ্বারা পরাজিত করিব। তাঁহার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইয়া তোমাকে দিব।"

অমনি দুর্যোধনের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মামা ভাগিনায় পরামর্শ পথিমধ্যেই স্থির হইল। দুর্যোধন পিতাকে গিয়া বলিলেন, "রাজন্, পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞে এত ধন রত্ন, এত দ্রব্য সামগ্রী

---

* আদিপর্ব ১—১৩

† সভাপর্ব ৪৮—১৫।:৬।

পাইয়াছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিমালয়ের কত পার্ব্বতীয় জাতি পিপীলিকা উত্তোলিত পিপীলিকা নামক স্বর্ণ রাশি রাশি উপহার দিয়াছে †। সিংহলের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদুর্য্যমণি ও কত কত মুক্তা প্রদান করিয়াছে *। পাণ্ডবেরা এমন অমূল্য রত্ন সকল পাইয়াছে যে তাহা আপনার ভাণ্ডারেও নাই। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, 'শত্রুর অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সে অতি অধম পুরুষ'।"

অন্ধরাজ নীরব রহিলেন। ভাবিলেন, শত্রুগণের এত বৃদ্ধি দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্থির থাকা উচিত নয়। তবে উপায়? তাহারা যে মহাবল। তখন শকুনি বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা নাই। আপনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে আহ্বান করুন। আমি অনায়াসে সকল জিতিয়া লইব।"

বৃদ্ধরাজ প্রথমে অসম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন অত্যন্ত জেদী, ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "আপনি আমার কথা না শুনিলে, নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব। ‡" শেষে অন্ধরাজ সম্মত হইলেন।

বিদুর তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি তখনই ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ রাজার পায় মস্তক রাখিয়া, অতি বিনীত ভাবে, অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পায় ধরি, আপনি কদাচ পাশা খেলায় সম্মত হইবেন না। তাহাতে জ্ঞাতি বিরোধ আরম্ভ হইবে, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইবে। হায় হায়, এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না।"

অন্ধরাজ শুনিলেন না। বলিলেন, "তুমি অদ্যই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে লইয়া আইস।"

মহাত্মা বিদুর তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, এ কুল আর রহিল না" শেষে তিনি ভীষ্মদেবের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন তিনি রাজ আজ্ঞায় অতি বিষণ্ণ মনে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলিলেন।

পরের দিন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বহু দাস দাসী সহ হস্তিনায় উপনীত হইলেন। দ্রৌপদীর শোভা, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণের প্রাণে ঈর্ষ্যানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা তাহা শীঘ্রই পতিপুত্রগণের হৃদয়ে ও সংক্রামিত করিলেন।

পরদিন পাণ্ডবেরা সভায় উপস্থিত হইলেন। অমনি অধীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পাশার অনেক নিন্দা করিলেন। তাহা শুনিয়া ধূর্ত্ত শকুনি

---

‡ সভাপর্ব্ব ৪৯—৪০।

† সভাপর্ব্ব ৫২—৪। পুরাকালেও ভারতের স্বর্ণের প্রবাদ বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। গ্রীক হেরোডোটাস খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন, "ভারতে প্রচুর স্বর্ণ আছে। কতক খনি হইতে উত্তোলিত হয়, কতক নদীর স্রোতের সহিত চলিয়া আইসে ও কতক মরুভূমি হইতে আনিত হয়। এই শেষোক্ত স্বর্ণ শৃগাল অপেক্ষা ও বৃহদাকার পিপীলিকাগণ বালুকার সহিত খুঁড়িয়া বাহির করিয়া উপরে আনিয়া রাখে। পরে তাহারা যখন আবার খনন করিতে ভূগর্ভে যায়, তখন ভারতবাসীরা উপরের পুঞ্জীকৃত মিশ্রিত বালুকা বোরায় ভরিয়া উষ্ট্রের উপর তুলিয়া অতি দ্রুতবেগে লইয়া আইসে। কারণ ঐ পিপীলিকাগণ জানিতে পারিলে উহাদিগকে মারিয়া ফেলে।" তৎপরে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসও এই পিপীলিকা উদ্ধৃত স্বর্ণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্রকায় অসভ্যরা স্বর্ণ খুঁড়িয়া বাহির করিত এবং তাহাদিগকেই ভারতবাসী দূর হইতে দেখিয়া পিপীলিকা বলিয়া অনুমান করিত।

সভাপর্ব্ব ৫২—৩৫।৩৬। তাহা হইলে তখনও সমুদ্র হইতে মুক্তা তোলা হইত।

বলিলেন "যদি ভীত হও, খেলিও না।" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "আমাকে কেহ কোন কার্য্যে আহ্বান করিলে, আমি কখনও পশ্চাদপদ হই না, এই আমার চিররীতি।"

তখন খেলা আরম্ভ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলেই তথায় বসিয়া আছেন। সভা গৃহ শত শত লোক পূর্ণ। শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিয়াই বলেন, 'এই আমার জিত" আর অমনি জিতিয়া লন। যুধিষ্ঠির ধন, রত্ন যতই পণ রাখিতে লাগিলেন, ততই হারিতে লাগিলেন। যতই হারিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হইতে লাগিল। তিনি এইরূপে সুবিস্তৃত স্বরাজ্য, সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী যাহা কিছু তাঁহার ছিল, সকলই হারিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্ধরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, মুমূর্ষু যেমন ঔষধ খায় না, আপনিও তেমনি আমার হিতকথা শুনিতেছেন না। আমি অনুপায়! আমি অনুপায়! তথাপি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, 'ক্ষান্ত হউন'। আমার দুর্য্যোধনের আজ হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। বৃষ যেমন মদভরে আপন শৃঙ্গ আপনিই ভাঙ্গিয়া ফেলে দুর্য্যোধনও আজ তাহাই করিতেছে। যাহারা তাহার সহায়, তাহার মঙ্গলের উপায়, তাহাদিগকেই দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ভ্রাতৃগণকে শত্রু করিয়া তুলিতেছে। হায়! হায়! সমুদয় কুরুকুল নষ্ট করিতে বসিয়াছে। কিন্তু মহারাজ, আপনি একটা কাকের জন্য এমন কুকর্ম্ম করিবেন না, শকুনির কপট ক্রীড়ায় জয়ী হইতেছেন বলিয়া আনন্দে অধীর হইতেছেন, কিন্তু এই পাশাই যে শেষে শর হইয়া সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই পাশা খেলা হইতেই ভয়ঙ্কর শত্রুতা আরম্ভ হইবে, শেষে যুদ্ধ বাধিবে, তাহা কি আপনি দেখিতে পাইতেছেন না? হায়! হায়! কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুপ্ত সিংহকে জাগরিত করিতে চায়? শকুনি যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশেই প্রস্থান করুক, পার্ব্বতীয় মুষা পর্ব্বতেই গমন করুক, কুরুকুল রক্ষা হউক।"

দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিয়া বিদুরকে বলিতে লাগিলেন, "আমরা শুধু সর্পকে পুষিতেছি। আপনি ধর্ম্মের ভান করেন, ধার্ম্মিক সাজেন, আর দিন রাত যাহাতে আমাদের ক্ষতি হয়, শত্রুগণের লাভ হয়, তাহাই পরামর্শ দেন। আমরা শত্রুকে পরাজিত করিয়া লাভবান হইয়াছি, ইহা আপনার সহ্য হইবে কেন? কিসে আমাদের হিত হয়, কিসে অহিত হয়, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, আমাদের ভাল মন্দ আমরা বেশ বুঝিতে পারি। আপনার ন্যায় নির্লজ্জের মুখ দেখিতে চাহিনা, যেখানে ইচ্ছা গমন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রতিবাদ করিলেন না। বিদুর মর্ম্মপীড়িত হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। একবার ভাবিলেন, এইস্থান হইতে প্রস্থান করি, আবার ভাবিলেন, থাকি, যদি কিছু উপকার করিতে পারি, আর ভীষ্মাদি সকলে সকল দেখিয়া শুনিয়া, অবাক হইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন।

আবার পাশাখেলা আরম্ভ হইল। আজ যুধিষ্ঠিরের বিদ্যা বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। শত্রুগণ

---

‡ সভাপর্ব্ব ৪৯—৫৫।

তাঁহাকে যে ভাবে পরিচালন করিতেছে, তিনি সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছেন। দুষ্ট শকুনি বলিলেন, "এখন কি পণ রাখিবে? মহারাজ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের আর আছে কি"? অমনি যুধিষ্ঠির অধীর হইয়া একে একে ভ্রাতৃগণকে পণ রাখিলেন, আর হারিলেন। শেষে নিজ শরীর পণ রাখিলেন, আর হারিলেন। তখন শকুনি বলিলেন, "এখন দ্রৌপদীকে পণ রাখ আর আছে কি, যে পণ রাখিবে?" অমনি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, আর অমনি হারিলেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার জিত হইয়াছে? কাহার জিত হইয়াছে?" শকুনি উত্তর করিলেন, "আপনার জিত হইয়াছে। দ্রৌপদীকেও জিতিয়া লইয়াছি।" অমনি অন্ধরাজ আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন আনন্দে আটখানা হইয়া সেই সভামধ্যে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহানন্দের ঝটিকা কুরুকুলকে মহা আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল না যে তাহাতে তাহাদের মূলোৎপাটন হইতে লাগিল।

এখন দুর্যোধন এক ভৃত্যকে বলিলেন, "দ্রৌপদীকে এই সভায় লইয়া এস।" সে দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিল। তখন দ্রৌপদী উত্তর করিলেন, "আগে গিয়া সভায় জিজ্ঞাসা কর, রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে আপনাকে পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন কিনা। আর তাহা হইলে, তৎপরে তিনি আমাকে পণ রাখিতে পারেন কিনা।" সে আসিয়া সভায় তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া দুর্যোধন ক্রোধে অন্ধ হইলেন। দুঃশাসনকে বলিলেন, "তুমি যাও, দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, পঞ্চ পাণ্ডব দেখিয়া ভীত হইও না।"

দুঃশাসন আজ্ঞা মাত্রেই আনন্দে প্রস্থান করিল। অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। দ্রৌপদী তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণের আশ্রয় লইবার জন্য ছুটিলেন। পাপাত্মাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ধরিয়া ফেলিল। দ্রৌপদী সে সময় একবস্ত্রা ছিলেন, তাহা জানাইলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিছুতেই ফল হইল না। দুঃশাসন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, আর বলিতে লাগিল, "তুমি একবস্ত্রাই হও, আর বিবস্ত্রাই হও, আমি তোমাকে সভায় লইয়া যাইব। তুমি এখন আমাদের দাসী।

দ্রৌপদীর চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন, সকলের নিকটেই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন, তথাপি গান্ধারীদেবীর দয়া হইল না, ধৃতরাষ্ট্রের অন্য মহিলারাও বাধা দিলেন না। দুরাচার দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে সেই সভা মধ্যে লইয়া গেল। তথায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবীরগণ বসিয়া আছেন, শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া হাসিতেছেন তথাপি কেহই এই উপায়হীনা, সহায়হীনা, নিরপরাধিনী রাজ নন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। তখন পাঞ্চালী কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃশাসনকে বলিলেন, "এ সভায় আমার কত গুরুজন আছে, আমাকে বিবস্ত্রা করিও না। আমাকে পণ রাখিলেও স্বামীগণের নিন্দা করিতে পারিনা। কিন্তু এই মহাসভা কিরূপে এই অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন, বুঝিতে পারিনা। তাহাতেই জানিতেছি, কৌরবগণ ধর্ম্মবিহীন হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তব্যের পথ

হইতে স্খলিত হইয়াছেন।” দুঃশাসন তাহা শুনিয়া আরও বলের সহিত তাঁহার কেশ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সে যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।

কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন “যে পঞ্চ স্বামী বরণ করিয়াছে, সে অসতী। তাহাকে সভামধ্যে উলঙ্গ করিলে দোষ হয় না। তুমি পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়িয়া লও।” অমনি পাণ্ডবগণ, কেহ পাছে গাত্র স্পর্শ করে এই ভয়ে, সমুদয় গাত্র বস্ত্র খুলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়া রাখিয়া আসিলেন।

এখন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আরম্ভ হইল। দ্রৌপদীর পরিধানে এক খানি মাত্র বস্ত্র। দুর্ব্বৃত্ত দুঃশাসন কর্ণের কথায় তাহাও আকর্ষণ করিতে লাগিল, সেই সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্রৌপদী অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কত প্রকারে সকরুণ বিলাপ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির নিকট কাতর কণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,তথাপি কেহই দুঃশাসনের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের প্রতি সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সাহায্য, তাহাদের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যাকে এইরূপ লোকাতীত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে দেখিয়া কি পাণ্ডবগণ স্থির থাকিতে পারিলেন? যখনই যে পাণ্ডব অধীর হইতে লাগিলেন, তখনই যুধিষ্ঠির চক্ষুর ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে শাসন ও শান্ত করিতে লাগিলেন। কাজেই পাণ্ডবগণ মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন, আর অসাধারণ ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এখন দ্রৌপদীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার চরম আরম্ভ হইল। দুরাচার দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার শরীরে যত বল ছিল, সমুদয় প্রয়োগ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী এখন উপায়হীন হইয়া, মন প্রাণ দিয়া, যিনি দীন দুঃখীর অবলম্বন, বিপদভঞ্জন, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। স্থির ও ধীরভাবে, শান্ত ও সমাহিতচিত্তে তাঁহার চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া বাহ্য ব্যাপার ভুলিয়া, এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃশাসন তাঁহার শরীরের সমুদয় শক্তি দ্বারা তাঁহার বস্ত্র টানিতে লাগিল, তথাপি তাঁহাকে বিবস্ত্র করিতে সমর্থ হইল না। শেষে সেই পাপাত্মা পরিশ্রান্ত হইয়া আপনা হইতেই বিরত হইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া পড়িল।

যখন পাপাত্মারা দেখিল, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল না, তখন কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন “এই দাসীকে গৃহে রাখিয়া এস।” তখন সে আবার দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।” এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে সভাস্থ সমুদয় গুরুজনকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, “আমাকে যেরূপ কেশাকর্ষণ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহাতে আমি প্রথমে প্রণাম করিতে অবসর পাইনাই। সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনারা বলুন, আমি অজিতা কি পরাজিতা?”

ভীষ্ম বলিলেন,“তাহা জানিনা, তবে এই জানি, নিশ্চয় এই বংশ ধ্বংস হইবে।” তথাপি কৃষ্ণা সেই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ তুলিতে লাগিলেন। তাহাতে ভীষ্ম বলিলেন, “যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা, তিনিই উত্তর করুন।”

যুধিষ্ঠির কি উত্তর করিবেন ? শকুনি যে প্রবঞ্চনা দ্বারা পরাজিত করিয়াছে, তাহার ত প্রমাণ নাই। কাজেই তিনি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু বিদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজকে পণ রাখিয়া বিজিত হওয়ায় প্রভুত্ব বিহীন হইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। বিশেষ দ্রৌপদী তাঁহার একার স্ত্রী নহেন।"

অমনি কর্ণ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দাসের যাহা কিছু থাকে, সকলই তাহার প্রভুর। পাণ্ডবগণ কৌরবগণের দাস হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীও কৌরবগণের দাসী হইয়াছে।" তৎপরে কর্ণ দ্রৌপদীর উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বরণ করিতে পার। দাসীর তাহাতে দোষ হয় না।"

পাপাত্মা দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া প্রশ্রয় পাইল। স্বীয় বাম উরুদেশের বস্ত্র অপসারিত করিয়া তাহা দ্রৌপদীকে দেখাইল, আর কুটিল কটাক্ষ করিতে লাগিল। সেখানে কত গুরুজন বসিয়া আছেন, তাহাতে সে বিন্দু মাত্র ও লজ্জিত হইল না।

ভীম আর থাকিতে পারিলেন না। হুহুঙ্কার ছাড়িয়া সেই সভামধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "রে পাপাত্মা দুর্য্যোধন, যুদ্ধে গদার প্রহারে তোর ঐ বাম উরু ভঙ্গ করিয়া তোকে নিহত করিব। আর দুঃশাসন, যুদ্ধক্ষেত্রে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব, এই আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা। সভাস্থ সকল সাক্ষী থাকুন, সাক্ষী থাকুন।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে বহু শৃগাল ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গর্দ্দভ সকল চীৎকার করিতে লাগিল, বিকটাকার পক্ষী সকল কর্কশ কলরবে প্রবৃত্ত হইল। ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীষ্মের বাক্য, বিদুরের সৎপরামর্শে যিনি ঠিকপথে আসেন নাই, কুকার্য্য হইতে বিরত হন নাই, তিনি এখন ভয়ে সৎপথে আসিলেন। তাঁহার মনে বংশ নাশ ভয় উদিত হইল। তিনি পলকের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। মৃদু মধুর ভাবে, মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "পাঞ্চালি, তুমি আমার পুত্রবধূগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সতী ও পরম ধার্ম্মিক। আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।" তিনি রক্ষের মলোৎপাটন করিয়া, মস্তকে জল ঢালিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী উত্তর করিলেন, "রাজন্, যদি বর দিবেন, তবে এইবর দিন যে রাজা যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।" অন্ধরাজ এমন চক্ষুষ্মান হইয়াছেন। বলিলেন "সে বর ত দিলামই, অন্য বর লও। তুমি একটী বরের যোগ্য নহ।"

তখন পাঞ্চালী বলিলেন, "রাজন্, তবে এই বর দিন যে আমার অন্য চারি স্বামীও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।" ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইল। এখন তৃতীয় বর। তোমার ন্যায় কন্যারত্নকে দুই বর দিয়াও মন পরিতৃপ্ত হইতেছেনা।"

কৃষ্ণা তখন উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্, লোভ ধর্ম্ম নষ্ট করে। এজন্য তৃতীয় বর চাহিনা। আমার স্বামীগণ নিতান্ত নীচদশায় পতিত হইয়াছিলেন। এখন যে তাঁহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন তাঁহারা সৎকার্য্য করিয়া উন্নত হইতে পারিবেন।"

সভায় সকলে বিস্মিত হইলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, দ্রৌপদী কি অবোধ মেয়ে। বিস্তৃত রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধারের এমন সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন!

কর্ণ পাণ্ডবগণের এত দুর্দ্দশা করিয়াও, এত দুঃখ দিয়াও, পরিতৃপ্ত হন নাই। এখন তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিলেন, "পত্নীই পাণ্ডবের গতি।"

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গমন করিলেন। করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "রাজন্, আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু অধীশ্বর। চিরদিনই আমরা আপনার দাস। আমরা আপনার কোন্ কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক। আমি আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সদ্দাক স্বরাজ্যে গমন কর। সুখে রাজ্য শাসন কর। আমার বিপুল বংশে একমাত্র তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ধার্ম্মিক। মনে রাখিবে, যেখানে জ্ঞান সেখানেই ক্ষমা। যিনি শত্রুতা পাইয়া মিত্রতা প্রদান করেন, তিনিই মহাত্মা।' (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

কবি-কুঞ্জে।

যখন কাব্য কুঞ্জ ফুটিবে
তখন সে ছিল ঘুমে
প্রভাত স্বপন নয়নে তাহার
ছিল সে আনন্দধূমে।
অরুণ তখন তরুণ রাগেতে
হেসেছে গগনোপরে,
কোকিল পাপিয়া, অমিয় ঢালিয়া
গেয়েছে করুণ স্বরে।
বেলের কলিকা প্রথম প্রভাতে
ফুটিয়া হয়েছে ফুল,
বনে চাঁপা-রাণী তুলে মুখ খানি
নাই যে তাহার তুল।
রূপসী যুঁথিকা হাসিয়ে তখন
ঢেলেছে মধুর বাস।
মন্দ মলয় গন্ধ লুটিয়ে
ছেড়েছে মৃদুল শ্বাস,
ধীর তরঙ্গা স্নিগ্ধ তটিনী
ধরি কুলু কুলু তান,
দগ্ধ হৃদয়ে মুগ্ধ করিয়ে
গেয়েছে মধুর গান!
হৃদয় কানন উঠেছিল হেসে
ফুটেছিল প্রাণে ফুল,
আনন্দ সাগর উছলি উঠেছে
পাইনি তখন কূল!

তখন—

প্রকৃতির ছবি হৃদয়ে জড়ায়ে
আসন গড়িনু তাতে,
আকুল অন্তর ডাকিল কবিরে
ধরিয়ে দুখানা হাতে!
তবুও তাহার ভাঙ্গিল না ঘুম
(সে যে) ভাবের স্বপন হেরে,
কাব্য-কানন কবিতার বন
পারেনা আসিতে ছেড়ে।
কহিল না কথা তবু কি উল্লাস
বহিছে প্রাণের মাঝে,
বীনার ললিত সুতান জিনিয়ে
আজো সে পুলক বাজে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

স্বরাজ।

(১৯)

রুশদেশ আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের জন্মভূমি। আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র রুশদেশেই রাষ্ট্র মার্ক্স-(Karl Marx) প্রচারিত সমাজতন্ত্র-বাদ (State-socialism) প্রকাশ্যে বরণ করিয়া তদনুরূপ গণতন্ত্র (Democracy) সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। শক্তি বিবর্জ্জিত, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত নিরুপদ্রব অসহযোগদ্বারা রাষ্ট্রে বিপ্লব উপস্থিত করিবার আধুনিক পদ্ধতির ও প্রচার রুশদেশেই। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশদেশে শতকরা অন্তত ৬০ জন ছিল কৃষক। বিগত যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে রুশদেশে শতকরা অন্তত ৮৫ জন গ্রামে বা ছোট সহরে বাস করিত। য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে রুশদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সব চেয়ে বেশী। আর হাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জার্ম্মান বন্ধু আমায় বলিতেন যে রুশদেশ আদৌ য়ুরোপে নয়, ওর সবটাই এশিয়াতে। আর টলষ্টয় বলিতেন যে রুশদেশীয় কৃষকদের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক দুর্লভ। আমাদের দেশের অবস্থার সহিত বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশদেশের অবস্থার একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রাষ্ট্র ও শাসনের আলোচনায় রুশদেশের কথা তুলিয়াছি।

কিন্তু বল বা শক্তি (Force) ও শক্তিমূলক শাসনের প্রয়োজন শুধু পাশ্চাত্য যবন সমাজে ছিল, আছে ও থাকিবে, তাহা নয়। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তেও ইহার প্রয়োজন ছিল, আছে ও বহুশতাব্দী যাবৎ থাকিবে। আজ না কি ভারতে রাবণ রাজত্ব, সেকালে ভারতে রাবণ রাজত্ব ছিল না। কিন্তু রাবণ রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুণ্যাবতার রাম ও অতুল-সংযমী লক্ষ্মণকে কত না বিপুল বল বা শক্তি আহরণ ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং' এই মহামন্ত্র যে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশের সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিই, তথায় তপস্বী মুনিগণই বা সর্ব্বথা কোপ-বিমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন কই? যে পুণ্যভূমিতে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিষ্কাম ধর্ম্মের দুঃসাধ্য মহান্ আদর্শের প্রথম প্রচার, সেই দেশেই ত আবার অবতীর্ণ ধর্ম্ম যুগে যুগে "পরিত্রাণায় সাধূনাম, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম" বল বা শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে দেশে প্রচারিত হইয়াছে, সে দেশেই বা পুণ্যশ্লোক রাষ্ট্রপতি অশোক কয়দিন স্বীয় রাষ্ট্রে অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন পদ্ধতি ও শাস্তি-বিধান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তখনও এদেশে প্রবল শক্তি, শক্তি-মূলক কঠোর শাসন, ও প্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রযত্নের পরেও ম্লেচ্ছগণ নাকি "স্থাতারো নভবন্তি।" কিন্তু শক্তি ও শক্তিমূলক শাসন সেখানেও মানব সমাজে চিরস্থির। সে শক্তি, সে শাসন শুধু ম্লেচ্ছের না-ও হইতে পারে, শুধু আর্য্যের না-ও হইতে পারে। যাহারই হউক্ তাহার প্রয়োজন আরও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত থাকিবে। মানুষের পেটে যতদিন ক্ষুধা আছে, মানুষ যত দিন কাম ক্রোধের অধীন, লোভ যতদিন মানুষকে কর্ম্মে নিয়োগ

করিবে, ঈর্ষা দ্বেষ বা প্রতিহিংসা যতদিন মানব অন্তরে সময়ে সময়ে জ্বলিয়া উঠিবে, সমাজে যতদিন একজন, এক বা বহুজনের উপর—পুরুষ স্ত্রীর উপর, সুজাত হীন জাতির উপর, সবল দুর্ব্বলের উপর, ধনী দরিদ্রের উপর, পণ্ডিত মূর্খের উপর, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের উপর—প্রতিপত্তি-লাভের বাসনা অন্তরে পোষণ করিবে, বিদ্বেষ যতদিন মানবমনে চির-নির্ব্বাপিত না হয়, আর যতদিন মানবের বাহুতে বল, মস্তিষ্কে উদ্ভাবনী শক্তি ও মনে তেজ আছে, ততদিন সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার জন্য মানবের পক্ষে শক্তি ও শক্তি-মূলক শাসনের প্রয়োজন থাকিবে। সে শক্তি ও শাসন নায়ক পিতৃগণেরই হউক, দলপতির হউক বা রাষ্ট্রপতিরই হউক। তাহার প্রয়োজন এই পৃথিবীতে আদিকাল হইতে আছে ও বহু শতাব্দী থাকিবে।

শক্তি ও শাসনের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যে রাষ্ট্র তাহার প্রজাসাধারণকে শুধু শাসনভয়ে চালিত করিবে ইহা কাজের কথা নয়। মানুষ ভয়ে কাজ করে সত্য, আবার সেই মানুষই প্রেমে প্রণোদিত হইয়া কাজ করে। ভয় যদি মানুষকে সংযত রাখে, প্রেম মানুষের কর্ম্মের উৎস। সমাজ বা ধর্ম্মসঙ্ঘের কথা বলিতেছি না, রাষ্ট্রের কথা বলিতেছি। রাষ্ট্র মানব মনের এই প্রেম বৃত্তিকে অবহেলা করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, মানবের স্বীয় স্বীয় জীবনে তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। মানবের প্রেম তখন স্বাধীনতার উন্মুক্ত আকাশে আপনা আপনি মানবকে কর্ম্মের পথে লইয়া যাইবে। যে রাষ্ট্র শুধু শাসনভয়ের কথাই বোঝে, কিন্তু মানব মনের প্রীতির পূর্ণবিকাশের পথে অন্তরায় বা তাহার প্রতি উদাসীন, সে রাষ্ট্র কখনও সুরাষ্ট্র নহে। মানব ভাঙ্গিতে জানে বটে। ভাঙ্গিবার ওস্তাদ মানুষের মত আর কে? কিন্তু গড়িতেও মানব স্বভাবতঃ চায়। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভাসমাজে যাহা কিছু গড়া হইয়াছে তাহার কতটুকু রাষ্ট্রের নিজের কৃতি? রাষ্ট্রের কথা ভুলিয়া গিয়া মানব স্বীয় অন্তরের প্রীতিতে বিভোর হইয়া আপন মনে আনন্দে গঠন করিয়া গিয়াছে।

প্রধানতঃ মানুষ লইয়াই রাষ্ট্র। সভ্য রাষ্ট্রমাত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৃথক্ সম্পত্তি (Private property) যদি সমাজে রাখিতে হয়, তবে রাষ্ট্র বলিবে—চুরি করিবে না, দস্যুবৃত্তি করিবে না, প্রবঞ্চনা করিবে না, অপরের সম্পত্তির নাশ বা অপচয় করিবে না। পৃথক্ সম্পত্তি থাকুক বা নাই থাকুক, রাষ্ট্র বলিবে—জখম বা খুন করিবে না, অপরের শরীরে বলপ্রয়োগ করিবে না, অপরের গতিবিধির স্বাধীনতার হানি করিবে না, অপরের চিন্তার স্বাধীনতার হানি করিবে না। মানুষ লইয়াই যখন রাষ্ট্র, মানুষগুলিকে রক্ষা না করিলে রাষ্ট্ররক্ষাও হয় না। মানুষগুলি রক্ষা পাইলে, সুস্থ সতেজ হইলে, তবে তাহাদের সহকারিতায়, তাহাদের অর্থসাহায্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব। কিন্তু সবদেশেই সভ্যরাষ্ট্র এ সকল নিষেধাজ্ঞার উপর এক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে—রাষ্ট্রদ্রোহী হইবে না। ইহার যে কোনও নিষেধ-বিধি অমান্য করিলে রাষ্ট্র তাহার প্রহরীর সাহায্যে শাসন করে।

প্রত্যেক মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততদূর পর্যন্ত সে অপরের সম্পত্তি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে।

আততায়ীর হাত হইতে তাহার প্রাণরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রহরী রাখিয়াছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য যদি সত্য সত্যই প্রয়োজন হয়, সে প্রহরীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য নহে। সে তখন অপরের বিনাশদ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের এই যেমন আত্মরক্ষার অধিকার, সমষ্টিভাবে রাষ্ট্রেরও এই অধিকার। রাষ্ট্রের এই আত্মরক্ষার অধিকার তাহার আপন প্রজার বিরুদ্ধে ও পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কোন রাষ্ট্রের বাহিরের শত্রু যখন সেই রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিতে চায়, সেই রাষ্ট্রের তখন অধিকার আছে যে, সে আপন রাষ্ট্রের লোকদিগকে বলিবে—"এসো, তোমরা আমাকে রক্ষা কর। তোমাদের অর্থে, তোমাদের সামর্থ্যে, প্রয়োজন হইলে, তোমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর। নতুবা তোমাদেরই সর্ব্বনাশ।" সমষ্টিভাবে রাষ্ট্র এই যে অধিকারের দাবী করে, ইহার সহিত মানুষের স্বীয় ব্যক্তিগত অধিকারের বিরোধ। এ বিরোধের মীমাংসা আজও হয় নাই। রাষ্ট্র এ দাবী করিয়াছে ও যথা সম্ভব দাবী আদায় করিয়াছে। আমাদের দেশে বিগত যুদ্ধে এদাবী খুব অল্পই আদায় হইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, এ দাবী যথাসম্ভব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়াছিল। যে এদাবী অগ্রাহ্য করিয়াছিল বা করিবার উপদেশ দিয়াছিল তাহাকেই শাসন করিয়াছে।

শাসনের কথা ত অনেক বলিয়াছি। পোষণ কি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? ধর্ম্মের বেলায় বলিয়াছি যে সচরাচর লোকের চোখে পড়ে ধর্ম্মের নিবর্ত্তনা বিধি, প্রবর্ত্তনা তত নয়। রাষ্ট্রের বেলায় ও তাহাই। হত্যা করিবে না, চুরি করিবে না—এই নিবর্ত্তনা বিধি লইয়া মানুষ ও রাষ্ট্র এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, প্রবর্ত্তনা যে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তাহা যেন লোকে বিস্মৃত হয়। আর এই বিস্মরণ যে শুধু আমাদের দেশেই—তাও নয়। তবে আমাদের দেশে রাষ্ট্র (State) ও শাসন (Government) এত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে রাষ্ট্রের নামই হইয়াছে "গভর্ণমেণ্ট্" (Government)। তাই বলিয়া আমাদের দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনা বা পোষণ ব্যবস্থা আদৌ করে নাই একথা বলা চলে না।

করুক বা না করুক, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্যের কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে পোষণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সুযোগ ও দায়িত্ব কতটা। রাষ্ট্রের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্র দায়ী। এ কাজে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীর সহকারিতা প্রয়োজন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে তাহার শৈশবকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রধানতঃ পিতামাতা দায়ী হইলেও, পিতামাতা যখন কর্ত্তব্য অবহেলা করে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা। আর এ দায় উদ্ধার শুধু শাসনদ্বারা হয় না। বালকবালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া সবদেশেই স্বীকার করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ লোকের মধ্যে নিম্নশিক্ষা বিস্তারই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানান্বেষণ ও তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তালিকার বাহিরে। কিন্তু দুটা কথা মনে রাখিলে এ মতের সমর্থন করা যায় না। প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য না হইলে তাহা

চলিতে পারেনা। পুরাকালেও রাজার অর্থসাহায্যে একাজ হইত। আর, এই জ্ঞানান্বেষণের সাহায্য না হইলে কৃষি বা শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। জ্ঞানান্বেষণের জন্য না-ই হউক, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা। দ্বিতীয়, সকল দেশেই কাজে দেখা গিয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশিক্ষার প্রচার অতি দ্রুত হয়। তারপর শিশু বড় হইয়া নিম্নশিক্ষা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, ইহা দেখা যে কারখানায় বা অপর কার্য্যক্ষেত্রে অনুপযোগী কার্য্যে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে বালকবালিকাগণ ভগ্নস্বাস্থ্য না হয়। বড় হইয়া তাহারা যদি শিল্প বাণিজ্য বা কৃষি কার্য্যে লাগিতে চায়, সমবায় পদ্ধতিতে (Co operative Principle) মূলধনের যোগাড ব্যাপার রাষ্ট্রের পরামর্শ ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাণিজ্য ও শিল্পবিস্তারের সহায়তা রাষ্ট্রের যেমনই কর্ত্তব্য তেমনিই প্রয়োজন ধনীদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে শ্রমজীবিগণ শিল্প সামগ্রী নির্ম্মাণের কল নহে, তাহারা দেহ মন আত্মায় গঠিত মানুষ। তাহাদের বাসস্থান পারিশ্রমিক প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রমজীবিদের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। আর এই কলকারখানার যুগে যখন অত্যধিক [illegible] অল্পসংখ্যক ধনীর হাতে আসিয়া ধনীর অত্যন্ত ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের অত্যন্ত দারিদ্র্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে তখন রাষ্ট্রের আর এক কর্ত্তব্য উপস্থিত ধন বিভাগে যাহাতে সমাজে যথা সম্ভব সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের দায়ভার ধনীর স্কন্ধে বেশী চাপাইতে হইবে।

এ তালিকায় অনেক কাজ আছে যাহা রাষ্ট্র নিজে না করিলেও রাষ্ট্র লোপ পায় না মনে কর মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও মাদক সেবনের মাত্রা স্থির করিবার ব্যাপারটা রাষ্ট্র আদৌ নিজ হাতে রাখিল না। এ ব্যাপারের পরিদর্শনের ভারও রাষ্ট্র নিজ হাতে রাখিল না। তাহাতে রাষ্ট্র লোপ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। উপযুক্ত লোকে মাদক সেবন কমাইবার ব্যবস্থা করিলেই সমাজের কাজ চলিতে পারে। মনে কর রাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের পথ ও যান প্রস্তুতের ব্যবস্থা কিম্বা ডাক বা তারে চিঠি বা সংবাদ প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রে কিছুদিনের জন্য নিজ হাতে রাখিল না। তাহাও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র বজায় রাখিতে হয় তবে যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময় রেলগাড়ী, ডাক ও তার রাষ্ট্রকে নিজহাতে নিতে হইবে। আর পুলিস ও সৈন্য রাষ্ট্র নিজ হাতে রাখিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে আর কাহাকেও অধিকসংখ্যক পুলিস বা অধিকসংখ্যক সৈন্য রাখিবার অধিকার রাষ্ট্র দিতে পারে না। দিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রাষ্ট্রের মূলভিত্তি বল বা শক্তি। আত্মরক্ষার মুখ্য উপায়, পুলিস ও সৈন্য, রাষ্ট্রের একচেটিয়া করিয়া নিজ হাতে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে হয় বলিয়াই যে আত্মরক্ষা শিক্ষাদান রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্যের তালিকার বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা নহে। রাষ্ট্রের মানুষগুলির দেহ, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা ও পূর্ণবিকাশ যদি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে ইহাও মানিতে হইবে যে ঐ মানুষগুলিকে সমষ্টিভাবে আত্মরক্ষা শিক্ষাদান রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২০)

সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখং। স্বাধীনতায়ই সুখ। সুখের চেয়েও বড় কথা—স্বাধীনতায়ই আত্মবিকাশ। মনে কর আমি একলা আছি, সমাজেও নয় রাষ্ট্রেও নয়। আমার স্বাধীনতার তখন সীমা নাই। যেই আমি সমাজে আসিলাম, তুমি ও আমি দুইজনে [illegible] কাছাকাছি থাকিতে আসিলাম, অমনি আমার অধিকারের আমার স্বাধীন বাক্যের ও কার্য্যের একটা সীমা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার স্বাধীনতার যে সীমা রেখা টানা হইল তাহা যেন তোমার অধিকারের সীমা। সমাজের সকল লোকের অধিকারের একটা সামঞ্জস্য করিয়া সমাজ প্রত্যেকের স্বাধীনতার সীমা রেখা টানিয়া দেয়। কল্পিত অরাজক সমাজেও প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার সীমারেখা থাকিবে। তবে এ স্বাধীনতা হ্রাসের একটা সার্থকতা আছে। সমাজে দশজনের সহিত থাকিলেই আত্মবিকাশের পূর্ণতা সম্ভব। তবুও সমাজ যদি স্বাধীনতার সীমা রেখা পাত এমন করিয়া করে যে তাহাতে তোমার আমার বিকাশ খর্ব্ব হয়, তবে সে সমাজ তোমার আমার পক্ষে কু-সমাজ। মাদ্রাজের "পঞ্চম" শ্রেণীর লোকেরা এখন নিজেদের "আদিদ্রাবিড়" নাম দিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে হিন্দু সমাজ তাহাদের বিকাশ খর্ব্ব করিতেছে। তাহাদের পক্ষে উহা কু-সমাজ। সমাজের বেলায় যেমন, রাষ্ট্রের বেলায়ও তেমন। রাষ্ট্র আসিয়া আবার নূতন রেখাপাত করিয়া আমার স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যাই সীমা অতিক্রম করিয়াছি, অমনই শাসন। শাসন অর্থ আমার অধিকার-নাশ। সুতরাং রাষ্ট্রের অধিকারে ও আমার অধিকারে বিরোধ। সে বিরোধে হার মানিতে হয় আমাকে। রাষ্ট্র ত হার মানিবে না। রাষ্ট্রের নিদেশ আজ্ঞা মানিতেই হইবে।

তার পরে ধর, আমাদের রাষ্ট্রে শ্যামবর্ণের বিভিন্ন জাতি (Race) আছে। তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এক জাতি অপর জাতির ভাষা বোঝে না। তাহাদের ধর্ম্মও বিভিন্ন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও বিভিন্ন। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রে মানুষের স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে অধিকার আর একটু সঙ্কীর্ণ।

অধুনা আমাদের রাষ্ট্রে শাসক সম্প্রদায় গোরবর্ণ ব্রিটিশ জাতীয়। শাসিত লোকগণ ভারতের শ্যাম ও গোরবর্ণের বিভিন্ন জাতীয়। ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, রীতি নীতি ও শাসিত লোকগণ আবার শাসক সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। ইহার ফলে শাসিত মানুষগুলির স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে অধিকার আরও একটু সঙ্কীর্ণ। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার দোষ যেমন আছে গুণ যে একেবারে নাই তাও নয়। ইহার ফলে মানুষগুলি কিছুটা বিরুদ্ধ-মত-সহিষ্ণু হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, রীতিনীতিতে, লোকগুলির সাদৃশ্য না থাকিলে "নেশান" বা জাতি (Nation) গড়ে না। আবার এসবে সাদৃশ্য থাকিলেই যে এক নেশান বা জাতি হয়, তাও নয়। "নেশান" ব্যাপারটা আমাদের দেশে ত খুবই নূতন আধুনিক যুরোপেও নূতন। আমাদের জাতি ছিল, গোত্র ছিল, বর্ণ ছিল, দল ছিল, রাষ্ট্র ছিল, "নেশান" ছিল না। সমগ্র ভারতবাসী ত দূরের কথা, আজও সব বাঙ্গালী ভাল করিয়া জমাট হইয়া এক নেশান হয় নাই। তবু যা হইয়াছে বাঙ্গালীই "নেশান" হইয়াছে।

আধুনিক য়ুরোপেও নেশান-বাদ ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব হইতে সুরু হইয়াছে, আজও তাহার জের চলিয়াছে। আমরা জাতীয়তাবাদ বা "নেশান"-বাদ (Nationalism) পাইয়াছি কিছুটা ইংলণ্ড হইতে, কিছুটা ইটালীর মাট্‌সিনির নিকট হইতে। "নেশান"-বাদের মূলকথা এই যে কোনও দেশে যখন সেই দেশবাসী অধিকাংশ লোক ভাষায়, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, আচার ব্যবহারে, রীতি নীতিতে জমাট বাঁধিয়া এক "নেশান" হইয়াছে তখন সে "নেশান" বা জাতির অধিকার জন্মে যে সেই দেশে সেই "নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ইটালীয় ও হাঙ্গারীয় নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের চেষ্টা করিয়াছে, তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গ্রীক্ ও সার্ভ প্রভৃতি "নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ইংরাজ তখন এই সব "নেশানের" স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের ইচ্ছার অনুমোদন করিয়াছে।

কিন্তু এই "নেশান"-বাদ (Nationalism) যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়াছে, য়ুরোপের বড় বড় প্রবল রাষ্ট্রগুলি তেমনই আবার, সাম্রাজ্য-বাদ, (Imperialism) প্রচার করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সাম্রাজ্য বাদের ভিত্তি যদিও বল বা শক্তি (Force), সভ্য সমাজে প্রবল রাষ্ট্রগুলি সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়াছে। তাহারা "জোর যার মুলুক তার" এ কথা না বলিয়া, বলিয়াছে যে গৌর বর্ণ "নেশানের" কর্ত্তব্য শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির ভার বহন করা। যে সব জাতি আত্ম রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া গৌরবর্ণ "নেশান" সমূহের কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে এই সাম্রাজ্য বাদের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ডিস্রায়েলি (Disraeli) ও তাঁহার প্রধান বন্দি কিপ্‌লিং (Kipling)। ইংরাজ জাতি "নেশান" বাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, দুইই আনিয়াছে। ইংলিশ্, স্কচ্, ওয়েলশ্, সব বাদ দিয়া নিজেদের নাম দিয়াছে "ব্রিটিশ নেশান"। আর নিজেদের সাম্রাজ্যের নাম, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য-বাদের প্রধান লীলাভূমি হইয়াছে আফ্রিকাতে, কারণ সেখানে বাহুবল, পাশব-শক্তি, জডশক্তি প্রচুর থাকিলেও তাহাকে রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত করিবার মানুষ সেদেশে নাই ও আফ্রিকার মানুষগুলি সভ্যসমাজে তাহাদের মনের দুঃখ জোরের সহিত জাহির করিতে শেখে নাই।

এই "নেশান" বাদ বা জাতীয়তা বাদ (Nationalism) ও সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) কথা স্মরণ রাখিলে বুঝা যাইবে আমাদের রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা কি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনা বিধি বা পোষণ কার্য্যের কথা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের দেশে তাহা কতটা সম্পাদন করা সম্ভব তাহার বিচারের সময়ও এই জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ও সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শাসক-সম্প্রদায় আর এক "নেশানের", তাহাদের দেশ সাত সমুদ্র তের নদী পারে। শাসক-সম্প্রদায় যে "নেশানের," সেই ব্রিটিশ "নেশানের" পৃথক্ স্বার্থ আছে। আমাদের দেশের শ্যামবর্ণ শাসিতগণ "নেশান" হইয়া উঠিতেছে বটে, আর যতটা "নেশান" হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারও বেশী জাতীয়তার দাবী করিয়াছে। কিন্তু শাসকসম্প্রদায়ের যে বৃটিশ "নেশান" তাহার মত জমাট জাতীয়তা পৃথিবীর অন্যত্র

দুর্লভ। ইংলণ্ডে দেখিয়াছি সাধারণ লোকের রাষ্ট্রপ্রীতিই হইয়াছে তাহাদের ধর্ম। এমন স্বদেশপ্রীতিতে আত্মহারা জাতি পৃথিবীতে দুর্লভ। সেই জাতি আবার সাম্রাজ্যবাদী।

আমাদের দেশে একই রাষ্ট্রের মধ্যে তবে নেশানে নেশানে সংঘর্ষ। আর এই বাষ্পশক্তি ও তড়িৎশক্তির যুগে, চীনদেশে মহামারী হইলে যখন বোম্বাই হইয়া মহামারী ভারতবর্ষে আসিয়া অধিষ্ঠান করে, ফ্রান্সে ছয়মাস যুদ্ধ চলিলে যখন কলিকাতায় শাকের দাম বাড়িয়া যায়, তখন শাসক সম্প্রদায়ের সুদূর দেশের "নেশানের" ও শাসিতগণের এ দেশের "নেশানের" স্বার্থের সংঘর্ষ কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা যদি তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হয়, রাষ্ট্রের শাসকসম্প্রদায়ের স্বজাতিপ্রীতি যদি স্বাভাবিক, অনেক স্থলে এক "নেশানের" লাভ যদি অপর "নেশানের" লোকসান, তবে রাষ্ট্র কেমন করিয়া [illegible] "নেশানের" প্রতি তাহার প্রবর্ত্তনা বিধি বা পোষণ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে? এ অবস্থায় শাসকসম্প্রদায় যদি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে না পারে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে যখন আমরা এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া, এই রাষ্ট্র লইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিব। সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে, যখন আমরা এই জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের স্কন্ধে সুখে সন্তুষ্টচিত্তে আরোহণ করিয়া শুধু আব্দার ধরিব "হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ।"

(২১)

আমার মনে আছে, ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভারত সভার (Indian Association) কমিটীর এক অধিবেশনের পরে বাড়ী ফিরিতেছি। আমার এক বন্ধু কথাটা তুলিলেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ যাহাতে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশগুলির মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হইতে পারে তাহার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত তাহা হইলেই তিনি খুসী। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মায়া আমার নাই। এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবার জন্য প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। এরূপ থাকিলে ভারতবর্ষ কিছুতেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না" বন্ধুটী বলিলেন যে "তবে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে এরূপ চেষ্টা করেন না কেন?" উত্তরে আমি জানিতে চাহিলাম, কিরূপ চেষ্টা, দুই চারিটি ইংরাজ বধ, না, কয়েকটা বক্তৃতা করিয়া দুই এক বৎসরে সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা? আমি ত পাগল হই নাই।

তাহার কয়েক বৎসর পর যখন "হোমরুল" (Home Rule) আন্দোলন চলিতে লাগিল, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বক্তৃতায় অনেক সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের দোহাই দিতেন। আমি ছিলাম এ বিষয়ে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহারা সত্য সত্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। এই বৃটিশ সাম্রাজ্য কালে নাকি বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া তাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন। আমার মতে মানবের ভ্রাতৃত্ব সমস্ত পৃথিবীতে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে

সাম্রাজ্যটার কিছু সংস্কারের প্রয়োজন—নলচে ও খোল দুইই বদলাইয়া সংস্কার করা দরকার। তাঁহারা এতটা অবিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯১৮ সালের আগষ্টমাসে বোম্বাইয়ে দাশ মহাশয় বক্তৃতায় আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যের দোহাই দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী আনী বেসান্ত একবার এক ঘোষণাপত্রে বিভিন্ন প্রদেশের নায়কদের স্বাক্ষর চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বাঙ্গালার কতিপয় নায়কের স্বাক্ষর দেওয়া হইয়াছিল। সেই পত্রে একটা কথা ছিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে পৃথিবীর কি অশেষ দুর্গতি হইবে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। স্বাক্ষরের পূর্ব্বে সেই পত্রের আলোচনার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলেও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ই টিকিয়া থাকিবে। কয়েক শতাব্দী না হয় তেমন ঝিকিমিকি জ্বলিবে না। রোম সাম্রাজ্যের জীবিতকালেও লোকে ঠিক ঐরূপ মনে করিত। কিন্তু রোমের সাম্রাজ্য গিয়াছে বলিয়া ভগবানের রাজ্যে লোকের অভাব হয় নাই। গৌরব মণ্ডিত ইতিহাস লইয়া কত নূতন নূতন রাষ্ট্র ও কত নূতন নূতন জাতি পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। যে কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে মানবজাতির আয়ু ও মূল্য বেশী।

কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাম্রাজ্যই বল আর রাষ্ট্রই বল, উহা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য, সমষ্টিভাবে ইতিহাসে মানবের আত্মপ্রকাশ, ও ব্যষ্টিভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানবের দেহ মন ও আত্মার বিকাশ। মানুষ যত বড়, রাষ্ট্র তত বড় নয়। যতদিন কোন সাম্রাজ্য দ্বারা সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়ত, মানবের বিকাশের সহায়তা হয়, ততদিন উহার আদর। তারপরে—সকল সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতার অনন্য নিয়মে যে সাম্রাজ্য তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ, তাহার বিলয়, আবার তাহার স্থানে সেই ভাগ্যবিধাতারই নিয়মে নূতন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য আসিয়া উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হয়। সার্গোনের আকাডীয় সাম্রাজ্য হামুরাবীর বাবিলোনীয় সাম্রাজ্য, আসীরীয় সাম্রাজ্য, সেকেন্দারের মাসিডোনীয় সাম্রাজ্য, সীজারের রোমীয় সাম্রাজ্য, খোস্‌রুর পারস্য সাম্রাজ্য, টাংদিগের চীন সাম্রাজ্য, জেঙ্গিস খাঁর মঙ্গোল সাম্রাজ্য অটোমান্ তুরস্ক সাম্রাজ্য আর ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য, আকবরের সাম্রাজ্য বা বৃটিশ সাম্রাজ্য—এসকলই সেই বিধাতার বিধানে উঠিয়াছে বা লয় পাইয়াছে বা পাইবে। যাহারা বিধাতার এই বিরাট প্রলয়লীলায় সহায়তা করে বা বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করে তাহারা ক্ষুধা, ব্যাধি ও মৃত্যুর তাণ্ডব অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। তোমার আমার ছোট খাটো সুখ দুঃখের কথা তাহাদের ভাবিবার অবসর নাই। ক্ষুধিত যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কি করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে, তাহাদের তখন উত্তর—যাও রাস্তা ঝাঁট দাও, নর্দ্দামা পরিষ্কার কর। শোকার্ত্ত মুমূর্ষু সান্ত্বনা চাহিলে তাহারা বলে—পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এ খেলায়, শবের স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ হইবে, নরশোণিতের ধারা নদীর ন্যায় বহিবে। এ অভিনয় সুরু হইলে, তাল সামলাইতে পারে এমন লোক বিরল।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উত্তর চরিতে তৃতীয় অঙ্ক।

মুরলা দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র নদী ; গোদাবরী উদ্দেশ্যে বহিয়া চলিয়াছে। ও ত নদী নহে—ও যে অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রার প্রেরিতা সখী, শিষ্যা, দাসী। দূতী হইয়া গোদাবরীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেছে। নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী মূর্ত্তি ধরিয়া মানবী হইয়াছে। কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তি জড়কে চৈতন্যময়ী করিয়াছে। অচেতনে প্রাণের প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে। পথিমধ্যে অপর একটি নদী—"তমসা" আসিয়া মিলিল, সে নদী পাতাল গর্ভ ভেদ করিয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তমসা অপেক্ষাকৃত বড় নদী. প্রকৃতি বড় ধীর, মুরলার মত চপলা নহে। মুরলা বালিকা, তমসা প্রবীনা । তমসাও আজ শরীরিণী, ভাগীরথীর বরে অদৃশ্যা। তমসা সীতার অপেক্ষা বয়সে বড, মান্যেও বড়, অভিন্ন হৃদয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত। সীতার উপর তমসার বড়ই স্নেহ, তমসার উপর সীতার বড়ই শ্রদ্ধা। পাতালবাসিনী তমসা ভাগীরথীর আজ্ঞায় সীতার সখী বা সহচারিণী হইবার জন্য পঞ্চবটীতে চলিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরের পর রামচন্দ্র পঞ্চবটী দর্শনে আসিতেছেন। অগস্ত্যদেবের আশীর্ব্বাদ ও লোপামুদ্রার নির্ম্মাল্য মাথায় করিয়া অগস্ত্যাশ্রম হইতে ফিরিতেছেন। লোপামুদ্রা রামচন্দ্রে বড়ই স্নেহবতী আর স্নেহও স্নেহ পাত্রের সর্ব্বদা অনিষ্টাশঙ্কী। করুণাময়ী দেবীর ভয়—রামচন্দ্র পঞ্চবটীর "বধূসহবাস বিস্রম্ভ সাক্ষী" স্থানগুলি দেখিয়া পাছে মোহ যান ; অতি গভীর শোকক্ষোভের সংবেগে পাছে তাঁর কোন প্রমাদ ঘটে—তাই গোদাবরীর উপর আদেশ হইল।

"গোদাবরি ! তুমি ধীরে ধীরে পদ্মপরাগ সুরভি, "শীকরকণা-শীতল" তরঙ্গবাতাস দিয়া রামচন্দ্রের মূর্চ্ছিত জীবন তর্পিত করিও।"

রঘুকুলদেবতা গঙ্গাদেবীর ভয় আরও অধিক। তাই সরয়ূ-মুখে তিনি রামচন্দ্রের জনস্থান আগমনের কথা শুনিয়া গৃহাচারচ্ছলে সীতাকে লইয়া আসিয়াছেন। "শোকমাত্র দ্বিতীয়" রামচন্দ্রের পঞ্চবটী দর্শনে যদি কোন অনর্থ ঘটে ; তবে সীতার দ্বারা সহজেই সে অনর্থের নিবারণ হইতে পারিবে। সীতাই যে রামচন্দ্রের মৌলিক সঞ্জীবনোপায়।

পাতালবাসিনী সীতা অবনীপৃষ্ঠচারিণী হইয়াও ভাগীরথীর বরে আজ মর্ত্ত্যলোকেরও অদৃশ্যা দ্বাদশবৎসরব্যাপী পতি বিরহে সীতার সেই রক্তিম কপোল পাণ্ডুর ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। সেই কুঞ্চিত কুন্তল বিলোল হইয়া মুখে ও চক্ষুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন করুণ রসের মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, বিরহব্যথা, শরীর ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সীতার সেই সুকুমার দেহখানি আজ হৃদয়কুসুমশোষী দীর্ঘ শোকে বৃন্তচ্যুত কিশলয়ের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সে ক্ষীণ পরিপাণ্ডু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মর্ম্মদগ্ধ কেতকী-গর্ভদলের নীলিমা লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক শেষ হইল। এইবার মূল তৃতীয়াঙ্কের যবনিকা উঠিল। এই অঙ্কে

মর্ত্ত্যমানবের অদৃশ্যা থাকিয়া সীতা পঞ্চবটীতে সঞ্চরমানা—তাই ইহার আর একটী নাম ছায়া অঙ্ক। রামের হৃদয়স্থা প্রেমময়ী সীতার স্মৃতি যেন আজ প্রত্যক্ষ দর্শনাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ভাবনা প্রকর্ষাৎ স্মৃতে দর্শনরূপতা ইতি (রামানুজ ভাষ্য)। কবি কল্পনা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নেপথ্য হইতে—"প্রমাদ প্রমাদ" কি অনর্থ, কি অনর্থ—এইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পুষ্পচয়নব্যগ্রা সীতা অমনই সকরুণৌৎসুক্যে সেই শব্দ লক্ষ্যে কর্ণ পাতিল। সীতার স্বহস্তপোষিত করিশিশু আজ মদমত্ত গজরাজ কর্তৃক আক্রান্ত। সীতা সসম্ভ্রমে কয়পদ ছুটিয়া গেল। কি সুন্দর। অতীতের সেই শল্লকীপল্লব গ্রহণে ব্যাকুল করিশিশুকে মনে পড়িল, চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ বনবাসস্মৃতি জাগিয়া উঠিল—সীতা উদ্‌ভ্রান্তা হইয়া বলিয়া উঠিল "আর্য্যপুত্র, আমার পুত্রকে বাঁচাও"। বার বৎসরের ব্যবচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া গেল। তন্ময়তায় অতীত বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হইল।

"কোথায় আর্য্যপুত্র"। তন্ময়তা ছুটিয়া গেল। অতীত অতীত হইয়া গেল। বর্ত্তমান বর্ত্তমান হইয়াই দেখা দিল। সীতা তখন সেই চকিতদর্শীবিপর্য্যাসে মূর্চ্ছিতা। এমন সময়ে জলভরা মেঘের ধ্বনির মত এক গম্ভীর মাংসল নিনাদ সীতার কর্ণবিবর ভরিয়া উত্থিত হইল। সীতার মূর্চ্ছা অমনই ছুটিয়া গেল। বহুদিনের পর ভাবাবেশও দ্রুত, আর তাহার অন্তর্দ্ধানও দ্রুত। বড় আশ্বাসে বড় আহ্লাদে সীতা মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরীর মত চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। সীতাবল্লভের অপরিস্ফুট (সীতার কাছে বড় পরিস্ফুট) দূরাগত ধ্বনি শুনিয়াই সীতা জানিতে পারিল—আর্য্যপুত্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত।

তমসার মুখে তখন সীতা শুনিল—রাজকার্য্য পালনের জন্য রামচন্দ্র জনস্থানে সমাগত হইয়াছেন। সীতাবল্লভ রামচন্দ্রের এই কঠোর রাজকর্ত্তব্য পালন দেখিয়া—সীতার বড় আনন্দ হইল। "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণরাজধর্ম্মঃ খলুঃ রাজা" এইখানেই সীতা চরিত্রেব একটী অনন্তসাধারণী বিশিষ্টতা। রামচন্দ্র যে রাজকর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন—ইহাতেই সীতার আনন্দ! যে কঠোর কর্ত্তব্যপালনের জন্য রামের সীতা বিসর্জ্জন—সে কর্ত্তব্য পালিত না হইলে তবে যে এই কষ্ট ভোগই বৃথা হয়! রামের প্রণয়ে সীতার অগাধ বিশ্বাস। নহিলে রাম সীতাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই রাজকর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বহন করিতে পারিতেছেন—এ বিশ্বাস সীতার নাই। এমত ধারণা জন্মিলে সীতার মুখে তৎক্ষণাৎ "দিষ্ট্যা" একথা শুনিতে পাইতাম না। নিষ্কলঙ্কা—তবু রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনী মত করিয়া বনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এ কারণ যে অভিমান, তাহা অবশ্য সীতার বুক ভরিয়াই আছে। এ লজ্জাকর ব্যথা অবশ্য মর্ম্মস্থলে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াই আছে। কিন্তু "অপরিক্ষীণরাজধর্ম্ম খলু রাজা"—এ কথাটীতে ঐ অভিমান ঐ ব্যথা নাই বা কোন প্রকার শ্লেষের ইঙ্গিতটুকুও নাই। ইহা উদার হৃদয়ের স্বতঃনিঃসৃত বাণী। রাম শোকে মুহ্যমান্ হইয়া রাজকার্য্য হয়ত ঠিক পালন করিতে পারিবেন না, এমন আশঙ্কা সীতার ছিল। কর্ত্তব্যচ্যুতির শঙ্কা কাটিয়া গেল, সীতার বড় আনন্দের কথা। রাম অত্যুত্তেজিত মুহূর্ত্তে সীতার সম্মুখে যখন বলিতে পারিয়াছেন যে "লোকারাধনা নিমিত্ত আমি স্নেহ, দয়া, বন্ধুত্ব (প্রীতি)

এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি।" আর আজ রামের যোগ্যাপত্নী রামপ্রিয়া সীতাও তখন না বলিবেন কেন ? (ভাগ্যবশতঃ) "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণ রাজধর্ম্মঃ খলু রাজ্ঞা"।

পঞ্চবটীর সেই চিরপরিচিত তরুলতা, সেই স্বহস্তপালিত পশুপক্ষী, সেই করুণাদ্রাবিতা গোদাবরী, সেই "বহু নির্ঝর কন্দর" গিরিতট,—রামের অন্তর্লীন দুঃখাগ্নি উদ্দামভাবে জ্বলিয়া উঠিল। রামও সংমূর্চ্ছিত, তাই দেখিয়া সীতা "ভগবতী তমসে, আমার আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও" বলিয়া তমসাব পায়ে পড়িল। তমসা আজ্ঞা করিল "তোমারই প্রিয় পাণিস্পর্শে জগৎপতি রাম বাঁচিবেন।" "যদ্ভবতু তদ্ভবতু যথা ভগবতী আজ্ঞাপয়তি"—যাহা হউক তাহা হউক,—যাহা ভগবতী আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা করি। এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কিনা জানি না, কিন্তু যখন ভগবতী (তমসা) আদেশ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে আমি স্পর্শ করি।* বঙ্কিমবাবু এই অর্থের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন "স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন না তখন যদু মধু কি বুঝিবেন!"

বঙ্কিম বাবু বলেন—"রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময় একবার ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয় পত্নীর মত তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যাহাহউক তাহাহউক আমি তাঁহাকে স্পর্শ করি।" ইহা ভাবিয়া সীতা স্পর্শ করিল, রামও চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর অর্থেব পরিপোষক প্রমাণ এই যে, তৎপরেই সীতা বলিলেন "ভগবতী তমসে, এস আমরা ফিরিয়া যাই। যদি ইনি (রাম) আমাকে দেখিতে পান, তবে এই অননুজ্ঞাত আগমনের জন্য (স্পর্শ ত দূরের কথা) আমার মহারাজ কুপিত হইবেন"।

অবশ্য বঙ্কিমবাবুর অর্থটি সূক্ষ্ম সমালোচনার হিসাবে ভালই প্রতীত হয়। কিন্তু আর একদিক দিয়া বিদ্যাসাগরের মতটিকে বেশ সমর্থন করা যায়। রাম মূর্চ্ছিত, এমত সঙ্গীন সময়ে অত মান অভিমান তর্ক উঠিতে পারে না। "বাঁচিবেনই" এমত নিশ্চিত বিশ্বাস সীতায় থাকিতে পারে না। তবে ভগবতী আদেশ করিতেছেন তখন স্পর্শই করি। সীতাকে তখন তমসা যে আজ্ঞাই করিবে, সীতা না ভাবিয়া চিন্তিয়া তখনই তাহা করিতে প্রস্তুত। রামের জীবন যে সঙ্কটাপন্ন, সীতার মনে তখন ঐ অভিমানোত্থিত বিতর্ক না উঠিবারই কথা। পরে যখন রাম জীবন পাইলেন, তখনই অননুজ্ঞাত সন্নিধান জন্য শঙ্কা হইল। শঙ্কা চৈতন্যলাভের অগ্রে নহে। তারপর হরিচন্দন পল্লবের প্রলেপবৎ চিরপরিচিত স্পর্শ—রামের অঙ্গে নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণরসের সেক দিয়া গেল। ইহা চিত্তের সঞ্জীবন অথচ মোহকর; মুহূর্ত্তের মধ্যেই সন্তাপজ মূর্চ্ছা নাশ করিয়া আনন্দের জড়তা আনিয়া ফেলিল। মূর্ত্তিমান প্রসাদের মত এই স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ কি ভুলিবার? "কোথায় প্রিয়ে জানকি,

---

* অবশ্য তাঁহার স্বকৃত (উত্তর চরিতের) সংস্কৃত টীকায়।

কোথায় আমার সেই আনন্দদায়িনী দেবী প্রতিমা?" রাম চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, "কোথায় প্রিয়তমা! ছায়ামূর্ত্তি ভাগীরথীর বরে যে রামের অদৃশ্যা। রাম তখন ভাবিয়া লইলেন—"নিজেরই প্রগাঢ় চিন্তা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়া গেল। ইহা তন্ময়তাজনিত একটা ভ্রান্তি মাত্র।

সীতার স্বযত্নপালিত সেই হস্তিশিশু মদমত্ত গজরাজকে পরাজিত করিল। সীতা আনন্দে সেই সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিল—দীর্ঘায়ু বৎস আমার, সৌম্যদর্শনা প্রিয়ার সহিত যেন অবিযুক্ত থাকে। এ বিরহেই সীতার যত ভয়। একে পতিবিরহ—তাহাতে আবার পুত্র বিরহ! রামায়ণের সীতাকে কেবল পতিবিরহই সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভবভূতির সীতা দুই প্রকার বিরহই সমভাবে ভোগ করিতেছে। উত্তর চরিতে সীতা পাতালে মাতার নিকট অবস্থিতা; পুত্রদ্বয় স্তন্যত্যাগের পর হইতেই বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত। (রামায়ণে বাল্মীকি আশ্রমেই সীতা সপুত্রক অবস্থিতি করিত।

কদম্ব শাখায় উন্নতশিখ মণিময় মুকুটের মত প্রিয়া সমেত একটা ময়ূর বসিয়াছিল। সেই সময়ে কি জানি কেন. সে স্বভাবসিদ্ধ কেকারবে ডাকিয়া উঠিল। বাসন্তী দেখিল, সীতার সেই পালিতপুত্র ময়ূর শিশু। সীতা দেখিয়াই চিনিল। রামের চক্ষে অতীতের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল;—সীতা ক্ষুদ্র করতলে করতালি দিতেছে, আর সেই ময়ূর শিশুটা সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে. আর সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষুপল্লব ও কেমন সুন্দরভাবে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। সীতার সযত্নরোপিত কদম্ববৃক্ষে দুই চারিটা ফুল ফুটিয়াছে। আর সীতার পালিত গিরিময়ূরটাও সেই বৃক্ষকেই আশ্রয় করিতেছে। রাম দেখিলেন—পক্ষীজাতি ও পরিচয় স্মরণ করে, স্নেহের মর্য্যাদা রাখে। আর তিনি শ্রেষ্ঠতম মানব হইয়াও কি করিলেন? রামের কান্না আসিল। তারপর বাসন্তী কদলীবন মধ্যবর্ত্তী একটি শিলাতল দেখাইয়া তাহাতে রামকে বসিতে বলিল। তথায় সীতার প্রিয় হরিণের দল আজিও তাহার চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইতেছে। এইখানে বসিয়াই যে সীতা তাহাদের কত আদর করিয়া খাওয়াইত। রাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া বসিলেন।

বাসন্তী ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতার পূর্ব্বস্মৃতি উদ্রেক করিয়া রামকে কাঁদাইতেছে। মন্দভাগিনী সীতাও পাষাণীর মত তাহা সহ্য করিতেছে। সেই পঞ্চবটী, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই "বিবিধ বিশ্রম্ভসাক্ষী গোদাবরী কাননোদ্দেশ," সেই পুত্রনির্ব্বিশেষ পশুপক্ষী, তরুলতা—এ সকল থাকিয়াও (সীতার কাছে) নাই। সীতা আর সীতা নহে। মর্ত্ত্যের পতি সোহাগিনী রাজরাণী আজ বিরহিণী, ভিখারিণী ও পাতালবাসিনী।

রাজরাজেশ্বরী আজ ছায়ামাত্র ধারিণী। আর সেই বিকলেন্দ্রিয় পাণ্ডুবর্ণ শোকদুর্ব্বল রামের অবস্থা দেখিয়া সীতার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তবু সীতা সেই অশ্রুপতনোদ্গমের অন্তরালে সতৃষ্ণনয়নে রামকেই দেখিতেছিল। সীতার সেই স্নেহনিঃস্যন্দিনী নয়ন কখন সুখে কখন দুঃখে কখন শূন্যতায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; দর্শন তৃষ্ণায় সে দৃষ্টি উত্তালদীর্ঘা, বিস্ফারিতা, দীর্ঘবৎ প্রতীতা। তমসা সস্নেহাস্রে দেখিল—সে দৃষ্টি দুগ্ধনদীর পয়োধারায় হৃদয়েশ্বরকে স্নান করাইয়া দিতেছে। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, যাহাকে আমার প্রাণ, আমার

দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না, অঙ্গের অমৃত" এই প্রকার শত শত বাক্যে ভুলাইতেন, সেই মুগ্ধা সীতাকে"—বলিতে বলিতে বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এই বক্তব্যটা শেষ না করাই এখানে সৌন্দর্য্য! অলঙ্কার শাস্ত্রমতে স্থান বিশেষে ন্যূনপদতা একটি গুণ। বাসন্তী মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পর উত্তর শুনিল—"লোকে যে সহ্য করিল না" অর্থাৎ আমি রাজা, প্রজার প্রতিনিধি; প্রজাদের যাহা সহ্য হইল না, কাজেই আমি ও সেই মতেই চলিলাম। রামের মনে একটি আত্মপ্রসাদ ছিল যে, তিনি প্রজার মতে চলিয়া প্রজানুরঞ্জন করিয়া যশোভাগী হইয়াছেন। বাসন্তী সেই আত্মপ্রসাদের উপর আঘাত দিল, জানাইল—

"অয়ি কঠোর! যশঃ কিল তে প্রিয়ং কিমযশো ননু ঘোর মতঃ পরং।"

অয়ি কঠোর, যশই এত আপনার প্রিয়, আর এই সীতা বিসর্জ্জনে কতদূর অযশ হইল তাহা কি জানেন? সীতা প্রাণের প্রাণ সে প্রিয় হইল না, প্রিয় হইল কি না যশ। ওহে যশলোলুপ, সীতা বিসর্জ্জনে কি আপনার যশ হইল, না অযশই হইল? বাসন্তীকে এত বড় আঘাত করিতে দেখিয়া সীতাও দারুণা ও কঠোরা বলিয়া বাসন্তীকে অনুযোগ না করিয়া পারিল না। "হরিণনয়না স্বভাবভীরু সীতার বনে কি অবস্থা হইল"—(বাসন্তীর) এই প্রশ্নেরই উত্তর রাম দিলেন। যে আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইল—তাহার আর উত্থাপন হইল না। *

"সখি কি আর মনে করিব? সেই "ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি" সেই "পরিস্ফুরিত গর্ভভরালসা" জানকীর "মৃদুমুগ্ধ মৃণালকল্পা জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতিকা" নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের দ্বারা চিরদিনের মতই বিলুপ্ত হইয়াছে।" আত্মপ্রসাদ নষ্ট হইল। সীতা ত চিরতরে লুপ্তা। তবে কি রহিল? রাম তখন মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। রামের হৃদয় দলিত হইয়া যাইতেছে, তবু দ্বিধা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে না। অন্তর্দ্দাহ সমস্ত অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে না। কি কষ্টকর অবস্থা!

বাসন্তী রামকে কাতরতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত দেখিয়া ধৈর্য্য ধরিতে কহিল। রামের শোকসাগরের অতি গভীর আবর্ত্ত বাসন্তী স্থির রাখিতে চাহিল। রাম শুনিয়া স্তম্ভিত! সীতাশূন্য দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার নামটিও পৃথিবীতল হইতে লুপ্ত হইতে চলিল; তবু রাম আজও বাঁচিয়া আছে। এ অপেক্ষা স্থির থাকা আর কাহাকে বলে? ধৈর্য্য আর কাহার নাম?

সীতার সব দুঃখ গেল। অভাগীর পরে এত প্রেম, অভাগীর জন্য আর্য্যপুত্রের এত কষ্ট! এ বিসর্জ্জন সার্থক! রামের এই প্রেমগর্ভ প্রিয়বচনে সীতা মোহিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা দেখিল, সর্ব্বনাশ! এখন সীতাকে এ স্থান হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই যে দুষ্কর হইবে। আর সীতাও কি ইহার পরে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? রামের এত অধৈর্য্য, তবে সীতার কাছে সংযম আশাই করা যে বৃথা হইবে? তমসা সীতাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইয়া, বলিল—

বক্তব্য ছিল নির্ব্বাসন দিলেন।

ত্রস্ত + একহায়ণ + ভীত—একবৎসর বয়স্ক। কুরঙ্গ—হরিণ

বৎসে। "নেতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোক-দারুণাঃ।
এতাস্তা মধুনোধারাশ্চ্যোতন্তি সবিষাস্তরি"।

বৎসে, এ বড় মনোহারী বাক্য নয়। এ স্নেহে আর্দ্র কিন্তু শোকে দারুণ, ইহা তোমার কাছে এখন বিষমিশ্র মধুরধারা।

বাসন্তী দেখিল, রামের হৃদয় অতীব নিষ্কম্প অথচ স্তম্ভিত, আবেগে হৃদয় পরিপূর্ণ। সীতা বিষয়ক প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রামের মনকে লইয়া যাইতে পারিলে এ কষ্ট দূর হইতে পারিবে—সেই আশায় তখন বাসন্তী রামকে জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লাগিল। সকলভাগেই যে সীতার ছবি; সকলস্থানেই যে সীতার স্মৃতি। বাসন্তী দুঃখেরই উদ্দীপক স্থানগুলিকে বিনোদের উপায় বলিয়া মনে করিল। বাসন্তী ভুক্তভোগিনী নহে। নিজে ভুগিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে, বাসন্তীর তাহা জন্মে নাই, তাই সে ভুল করিল। সীতা ঠেকে শিখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে—তাহার কাছে কাজেই সে ভুল ধরা পড়িল। বাসন্তী যে ইচ্ছাপূর্ব্বক রামকে কষ্ট দিবার জন্য জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লইয়া যায় নাই—তাহা তাহার স্বগতঃ উক্তিতে সুস্পষ্টই বুঝা যায়—যথা "কষ্টমত্যাপন্নোদেবঃ, তদাক্ষিপামি তাবৎ"

বাসন্তী একটী লতাগৃহের দ্বারে রামকে লইয়া আসিল সেই লতাগৃহ—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণা
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরী সৈকতে
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

সীতার সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি—কাতরতা নিবন্ধন সেই মুগ্ধ প্রণামাঞ্জলি, রামের চক্ষুতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। প্রতিপদে কেবল হৃদয় লইয়া ঘাত প্রতিঘাত; মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আদি করুণের অপূর্ব্ব লহরীলীলা।

রাম গাঢ় তন্ময়তাবশে চারিদিকেই সীতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলেন; সীতার স্মৃতি আজ মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাম তাহাকে (আবছায়া রকমে) পাইয়াও পাইতেছিলেন না। প্রেমবিহ্বল ভাবপ্রবণ রাম, সীতার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যেই তার ছবি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বলিলেনও তাই "চণ্ডি জানকি তুমি চারিদিকেই আমাকে দেখা দিতেছ, তবে অনুকম্পা করিতেছ না কেন?" সীতা যেন অভিমানবশে রামকে দেখা দিয়াও ধরা দিতেছিল না; প্রণয়কোপে কোপনা হইয়াছে বলিয়াই রাম সীতাকে "চণ্ডী" এই সম্বোধন করিলেন।

রাম চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—সীতা নাই। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। দেহের বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিল, নিখিল চরাচর শূন্যবৎ প্রতীত হইল। তখন রামের বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। দারুণ মোহ চারিদিক দিয়া তাঁহাকে ছাইয়া ফেলিল। রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

সীতাও মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা। তমসার মুখে তাঁহার পাণিস্পর্শই রামচন্দ্রের জীবনলাভের একমাত্র

উপায়—শুনিয়া সীতা সসম্ভ্রমে রামের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিল। এবার দ্বিতীয়বার স্পর্শ; কাজেই মনে আর কোন সঙ্কোচ, ভয় বা ভাবনা কিছু নাই। রামেরও চেতনা ফিরিয়া আসিল। সেই স্পর্শের মাদকতায় বিভোর রামচন্দ্র আনন্দ নিমীলিত নয়নেই বাসন্তীকে কহিলেন—"সখি বাসন্তী! কি আনন্দ। জানকীকে পাইয়াছি।" অবশ্য গাঢ তন্ময়তাজাত বিভ্রান্তিতেও কদাচিৎ এমত অবস্থা হইতে পারে। অবশ্য এখানে ছায়াসীতাই কারণ; বিভ্রম নহে। ভালবাসার সন্তাপহর সুখস্পর্শে সীতার বহুকালের সন্তাপ কোথায় চলিয়া গেল। স্বেদসিক্ত বাহু বজ্রলেপবদ্ধ—অবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন স্বেচ্ছাস্পর্শ, অমৃতশীতল কঙ্কণধর সীতার বাহুটী রাম অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ললিতলবলীপল্লববৎ সুকুমার সে তুষারকরকাসদৃশ সুশীতল, চিরপরিচিত বাহুর স্পর্শে রামের ইন্দ্রিয় আবেশে শিথিল ও জড় হইয়া আসিতে লাগিল। যেমনই রাম "সখি বাসন্তী এই ধর" বলিয়া হাতখানি বাসন্তীকে ধরিতে বলিলেন অমনই সীতা সসম্ভ্রমে সে হাত সরাইয়া লইল। রাম অনুভব করিলেন, জড় হইতে যেন সহসা জড় খসিয়া গেল।

রামের স্পর্শ—বহুদিনের পর সেই আবেশময় স্পর্শ—সীতাও জ্ঞান হারাইল। সীতার চক্ষু আবেশে মুদিয়া আসিল, ইন্দ্রিয় শ্লথ হইয়া গেল। সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে রাম সীতার বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। যখন দুই জনের স্পর্শে দুই জনেই বিভোর—সে সময়ে কাহারও চেতনা নাই। সে অবস্থায় রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, হস্ত দুইটী (দুজনের) অবশ হইয়াই ভাবাবেশে ঈষৎ কাঁপিতেছিল মাত্র। যখন সেই স্পর্শবিচ্যুতি ঘটিল, তখনই রাম অনুভব করিলেন "জড় হইতে জড় খসিয়া গেল।" স্পর্শকালে কিন্তু জড়ে জড় ছিল, কম্পবানে কম্পবান্ কিছু ছিল—এ উপলব্ধি ছিল না। সীতা সরিয়া গেল, আর রামের অপ্রকৃতিস্থ স্তিমিত চক্ষু চতুর্দ্দিকে সীতার অনুসন্ধানেই বৃথাই ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। এইখানেই তমসার বর্ণনার ভিতর দিয়া সীতার একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তমসা একটু হাসির সহিত একটু কৌতুকের সহিত সীতার পানে স্নেহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

সস্বেদ রোমাঞ্চিত কম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শ সুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃস্ফুট কোরকেব ॥

সীতা স্বেদজলসিক্তা কদম্বযষ্টিও নবজলসিক্তা। সীতা রোমাঞ্চিতা, কদম্বযষ্টিও স্ফুটকোরকা। সীতা কম্পমানা, কদম্বযষ্টিও বায়ুচালিতা। বৎসা সীতাই আজ কদম্বযষ্টির অবস্থায় উপনীতা। গুরুজনের মুখে কদম্বযষ্টির সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া সীতা বড় লজ্জা প্রাপ্তা হইল। ভগবতী কি ভাবিবেন? যিনি আমাকে কলঙ্কিনীরূপে দশের কাছে দাঁড় করাইয়া নির্ব্বাসিতা করিলেন; তাঁহার উপর এখনও এত অনুরাগ, সীতা বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাহার নারীহৃদয়, তাহারই অজ্ঞাতে কিছু কুণ্ঠিত, আত্মসম্মান একটু আহত হইয়া পড়িল। তবে গাঢ় ভালবাসার কাছে ও সমস্ত তুচ্ছবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ও সকল ফেনা বুদ্বুদের মত উপরে ভাসিয়া থাকে মাত্র।

রাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সীতা যদি সত্যই আসিত, তবে বাসন্তী কেন

তাহাকে দেখিতে পাইল না? তবে কি সে আসে নাই? নিশ্চয় তাই। এ কি স্বপ্ন? কৈ, আমি ত নিদ্রিত নহি। তখন রাম নিশ্চয় করিলেন—

সর্ব্বথা স এব অনেকবার পরিকল্পনা নির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুনপুনরণুবধ্নাতি মাং (কষ্ট দিতেছে)

সীতার গাঢ় স্মৃতি সীতার ছায়া ধরিয়া রামকে মধ্যে মধ্যে ছলনা করিত। আর আজ সীতা সাক্ষাৎ ছায়ামূর্ত্তি, ইহাই বিশেষ)

বাসন্তী জটায়ু রাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গ তুলিয়া বীরের হৃদয়ে উত্তেজনা আনিবার চেষ্টা করিল। বীরত্বের উদ্দীপনা দুঃখশোক দূর করিয়া বলই আনিয়া দিবে। রামের চিত্তে একটু ফলও ফলিল। কিন্তু সীতার অবস্থা আরও সঙ্গীন হইল। তখন অতীতের দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাসিত। স্মৃতি অনুভূতির আকারে বিবর্ত্তমানা। মুহুর্ত্তের জন্য বিভ্রম—সম্মোহের আবির্ভাব। ভাবাবেগে উন্মত্তা সীতা, "আর্য্যপুত্র আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া তখন চীৎকার করিয়া উঠিল। উন্মত্ততার পরই অবসাদ, প্রকৃতিরই নিয়ম। সীতা শুনিল, রাম বলিতেছেন "যে এ বিরহ নিরবধি, ইহার কোন প্রতিকারই নাই" যেটুকু আশা ছিল তাহাও নিঃশেষ হইল। আশা গেলেই সকল ফুরায়। সীতারও সবই ফুরাইল। অবসন্না সীতা "আমি জন্মের মত গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাম আর কাঁদিতে পারেন না, সীতার যে স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখিতে পারেন না—তখন রাম সেই স্থান ত্যাগ করার জন্য বাসন্তীর নিকট অনুমতি চাহিলেন। রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন কিন্তু সীতা উদ্বেগে ব্যাকুলা হইয়া "ভগবতি তমসে, আর্য্যপুত্র যে চলিয়া যাইতেছেন" বলিয়া তমসাকে জড়াইয়া রহিল। কি ঔৎসুক্য কি উদ্বেগ, কি কাতরতা কি বা মোহ! রাম স্বহস্তে সীতাকে বনে নিক্ষেপ করিয়াছেন—কাজেই তাঁহার পক্ষে সেই স্মৃতি চিহ্নগুলি দেখা বড়ই অনুতাপকর। সীতা ত আর নিজে ত্যাগ করে নাই তাহার দুঃখের মধ্যেও যে সান্ত্বনা আছে। আর সীতার অনুতাপের ত লেশমাত্রও কারণ নাই। নিজ হস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের যে কি জ্বালা তাহা রামই জানেন, সীতা ত তাহা জানে না। আর তদ্ভিন্ন সীতা রামকে চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছে, রাম ত পাইতেছেন না।

কাজেই সীতা চলিয়া যাইতে চাহিবে কেন? কত কালের পর যে প্রথম সীতা আজ প্রাণ ভরিয়া দুর্লভদর্শন প্রিয়তম রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছে; সে আজ কেমন করিয়া সে স্থান ছাড়িয়া যাইবে? রাম সীতাকে ত দেখিতে পাইতেছেন না, দেখার বলবতী তৃষা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে মাত্র। রামও সীতাকেই দেখিতে চান! সীতা কোথায়? অগত্যা অশ্বমেধযজ্ঞার্থে প্রস্তুত হিরন্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দেখিয়া রাম আপনার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষু তৃপ্ত করিবেন, স্থির করিলেন।

কি, সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ! আর তাহা অযোধ্যায়! অশ্বমেধযজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর নিমিত্ত? সীতা কৃতার্থা হইল। পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্য তাহার হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়া গেল। শিথিলবৃন্ত ফলটী ধৈর্য্যবন্ধনে বদ্ধ রহিল।

সেই হিরন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি ধন্যা, যে আজ জীবলোকের আশাভরসা হইয়াছে। এ এক

আশ্চর্য্য প্রকারের ঈর্ষ্যা ও অসূয়া নিজে অধন্যা হতভাগিনী কিন্তু তাহারই প্রতিমূর্ত্তি আজ কি ধন্যা, কি সৌভাগ্যবতী। নিজের উপর এমন সুন্দর ঈর্ষা অসূয়ার ভাবটা বড়ই উপভোগ্য ।

বাসন্তী রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের মত দিল। তমসাও সীতাকে বলিলেন "এখন চল বৎসে আমরাও যাই।" সীতা মুখে বলিল মাত্র "চলুন যাই" কিন্তু সে আজ কেমন করিয়া যাইবে ? তাহার তৃষ্ণাদীর্ঘ চক্ষু যে প্রিয়তম রামচন্দ্রে আজ নিষাত হইয়া আছে ।

রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় চলিয়া যাইলেন। আর তমসার অঙ্গে ভর দিয়া সীতাও ধীরে ধীরে ছায়াখানির মত চলিয়া গেল। যেন অশরীরিনী সীতার ছায়াই রামের সম্মুখ হইতে নীরবে প্রস্থান করিল ।

এই তৃতীয়াঙ্কে একই করুণরস (আলঙ্কারিকমতে অবশ্য করুণাবিপ্রলম্ভাখ্য আদি রস) নানা ব্যাভিচারী ভাবের মধ্য দিয়া পৃথক পৃথক রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই করুণরস বর্ত্তমান। লজ্জা, নির্ব্বেদ, দৈন্য, জড়তা, উৎসুক ও ভয়, হর্ষ, বিষাদ, স্মৃতি ও মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাবগুলি একই করুণরসকে বিবিধ আকার দিয়াছে। তাই এই একই করুণরস সারা তৃতীয়াঙ্ক ব্যাপিয়া প্রবাহমান থাকিয়া এক অপূর্ব্ব কবিত্বের বিকাশ করিয়াছে। বিশ্ব সাহিত্যে এ কবিত্বের তুলনা নাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন (বঙ্কিমবাবু) নাট্য হিসাবে তৃতীয়াঙ্কের মূল্য তেমন নাই। সে নাট্য কি ইংরেজি? সংস্কৃত নাট্য অবশ্যই নহে। কোথায় কোন ব্যভিচারীভাব কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— তাহা টীকার সহিত তৃতীয়াঙ্কটি মিলাইয়া পড়িলে সকল পাঠকই বুঝিতে পারিবেন। আর জানিতে পারিবেন, একই করুণস্রোত কিভাবে কত দিক দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কবির সহিত সকলেই এখন একবাক্যে বলিবেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদা
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথ গিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
অম্ভো যথা সলিলমেবতু তৎ সমগ্রং ॥

কি সাহিত্য হিসাবে কিবা নাট্যহিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তুলনা নাই ।

"রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণ য়োরিব"

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী ।

"ওয়া গুরুজী কা ফতে !"

কৃষ্ণপক্ষ নিশিথিনী, নিখিল ভুবন
সুখ-সুপ্ত, মাতৃ-অঙ্কে শিশুর মতন,
ঊর্দ্ধাকাশে তারাপুঞ্জ স্নেহ-দৃষ্টি প্রায়
জাগিছে ধরিত্রী-শিরে, বিজলী-লীলায়
তা'রি ছায়া বহে বুঝি বসুন্ধরা-বুকে
চঞ্চল খদ্যোতকুল।
নির্ভয়ে কৌতুকে
একাকী গোবিন্দসিংহ বনপথ ধরি'
অগ্রসিলা হেনকালে ; দিতে ধৌত করি'
গুরুর চরণাম্বুজ পড়িতেছে ঝরি'
নবীন শিশির শষ্পে, শ্রম অপসরি'
বহিছে সমীর ধীরে, পত্রপুষ্পাঞ্জলি
অর্পিছে প্রকৃতিরাণী বিহঙ্গ কাকলি
অতর্কিতে জাগি' কভু গাহিয়া বন্দনা
থামিছে অজ্ঞাতে পুনঃ।
পূরাতে কামনা
আসিলা মহাত্মা কোন্ গহন কাননে
শুনেছেন শিখগুরু, হেরিতে গোপনে
চেয়েছেন তিনি তাঁরে, তাই এ নিশীথে
চলেছেন গুরু একা।
ভ্রম হয় চিতে
দিব্যলোক হতে কোন্ পুরুষ প্রধান
আবির্ভূত বনভূমে ! গাম্ভীর্য্য মহান্
শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্য সাথে ওতপ্রোত হয়ে
পেতেছে আসন তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ে
শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিত করি'।
অদূরে সহসা
হেরিলা গোবিন্দসিংহ বিদূরি' তমসা
প্রজ্জ্বলিত ধূনি পাশে সৌম্য দরশন
সুকুমার সাধু এক ধ্যানে নিমগন
আত্মানন্দে ডুবি' যেন !. করুণ-কোমল
তেজোদৃপ্ত মুখ পানে বিস্ময়-বিহ্বল
নিরখি' ক্ষণেক গুরু সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়
নমিলেন যুক্ত করে !
ফুল্ল কলি প্রায়
মেলিয়া পঙ্কজআঁখি সাধু ক'ন ধীরে
সম্ভাষি' গোবিন্দসিংহে (সারা চিত্ত ঘিরে
বাজিল মধুরে বীণ।)—"এস নরোত্তম !
বস এই কৃষ্ণাজিনে। নিত্য নিরুপম
কি তাঁর সাধনা-সাধ অন্তরে তোমার
সিন্ধুর তরঙ্গ হেন অদম্য অপার
জাগিছে জানিগো আমি ! একদা তাহার
প্রবল প্লাবনে যত কলঙ্ক-আঁধার
ঘুচিবে ভারত হতে ! সোণার ভারত
হাসিবে গৌরবে পুনঃ উদ্ভাসি' জগত
ধর্ম্মে কর্ম্মে মুক্ততায়। তুমি শক্তিধর
নব যুগপ্রবর্ত্তক ! বিশ্বাস নির্ভর
কর এই বাক্যে মম, দিব্য দৃষ্টি বলে
হেরিতেছি ভবিষ্যৎ।"

গুরু কুতূহলে
কহিলেন মুগ্ধচিত্তে "তুমি অন্তর্য্যামী
বুঝিলাম প্রভু, আজ। বড় ভাগ্যে আমি
পেয়েছি দর্শন তব। চিরনিশিদিন
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে হইয়া বিলীন
যে ধ্যানে রয়েছি ডুবি, সাফল্যের তার
শুনাইলে বার্ত্তা তুমি ! এত অত্যাচার
জন্মভূমি বক্ষে মম নীরবে সহিতে
পারি না পারি না আর ! মরম-শোণিতে
সঞ্চারিত হলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
জ্ঞান-শক্তি হারাইয়ে দুস্তর-পতনে
মূর্চ্ছাতুর দেশবাসী ; জরাচ্ছন্ন প্রাণ
নাহি করে অন্ধকারে আলোক সন্ধান
দারুণ মরণে বরি' ! হয় আশা মনে
শুনি শুধু মহাত্মন্ ! বিশাল ভুবনে
আছ জ্ঞাত প্রতিকার উপায় ইহার
শাশ্বত সহজসাধ্য ; তাঁ'ই কৃপা করে
আজিকে আমারে কহ !'"

সাধুর অধরে
ফুটিল মধুর হাসি, কন মৃদুভাষে
"সে উপায় কহিবারে তোমারে যে পাশে
এনেছি গোপনে ডাকি'। তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
এখনি কহিব আসি'।"
বন-অন্তরাল
পলকে পশিল সাধু, মাধুরী-বিজলী
চকিতে খেলিয়া গেল! গুরু কুতূহলি
রহিলা একাকী বসি'! ধূনির অনল
নিরখিতে ভবিষ্যৎ হইল চঞ্চল
বিস্তারি' সহস্রশিখা।
ম্লান করি তায়
বিশ্ব-চিত্ত-উন্মাদক রূপের প্রভায়
তিলোত্তমা সমা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী
সহসা পশিল সেথা, সারা অঙ্গ ভরি'
ঝলকিছে বহুমূল্য হীরকখচিত
সুবিচিত্র অলঙ্কার, যেন উল্লসিত
চাঁদে চুম্বি' তারাদল!
বিস্মিত গুরুর
পদতলে বসি' বামা কহিল মধুর
আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে-"ক্ষম হে সুন্দর।
রূপমুগ্ধা রমণীর তৃষিত অন্তর
উৎসৃষ্ট চরণে তব। ছদ্ম-সাধুবেশে
আহ্বানিয়া এ বিজন অরণ্য প্রদেশে
তোমারে এনেছি দেব। ফুলের মতন
বিকশিত উচ্ছসিত প্রফুল্ল যৌবন
অতুল ঐশ্বর্য্য আর, সব সমর্পণ
করিতেছি তব করে। হে প্রাণ-অঞ্জন।
লহ তুমি কৃপা করে! রাতুল চরণে
দাও স্থান এ দাসীরে!"
সুরেন্দ্র-ভবনে
বীরেন্দ্র পার্থের পাশে মুগ্ধা উর্ব্বশীর
প্রেম-নিবেদন এ কি! কাল-ভুজঙ্গীর
একি তপ্ত নিশ্বাস! শিখগুরু ত্বরা
ঈষৎ পশ্চাতে সরি' দীপ্ত বহ্নিভরা
কহিলেন বজ্রকণ্ঠে "কে তুই ডাকিনী
ছলিতে আসিলি মোরে?"

হাসিয়া কামিনী
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানি' অন্তর-অন্তরে
লালসার বহ্নি ঢাকি' সোহাগের স্বরে
উত্তরিল "হে প্রশান্ত। শান্ত হও তুমি,—
আমি তো পিশাচী নহি। সারা আর্য্যভূমি
একটু করুণা তরে আজিকে যাহার
রয়েছে উন্মাথ হয়ে 'অনুপ কৌঁয়ার'
আমি সেই, প্রাণেশ্বর। শৌর্য্য বীর্য্য তব
মোর বুদ্ধি অর্থ সনে মিলি' অভিনব
অদম্য শক্তির ধারা করিয়া সৃজন
জন্মভূমি বক্ষ হতে সকল বেদন
কলঙ্ক-কালিমা সব দিবে প্রক্ষালিয়া
জাহ্নবী-প্রবাহ সম। গর্ব্বে উপেক্ষিয়া
ঠেও না হৃদয় মোর। পূজার থালায়
লহ তুলি' তব নাথ! ধন্য হায়,
জীবন যৌবন মম, হইবে সফল
উদগ্র সাধনা তব!"

মুহূর্ত্তে অনল
স্পর্শিল স্ফুলিঙ্গ স্তূপে। দৃপ্ত ক্রোধভরে
কহিলেন শিখগুরু (নিশীথ অম্বরে
গর্জ্জিল অশনি যেন!) "অনুপ কৌঁয়ার!
জানি তোরে দুশ্চারিণি। ধিক শতবার
যৌবনে সম্পদে তোর। তুই যদি আজ
না হ'তি অবধ্যা নারী, হানিতাম বাজ
তোর শিরে পদাঘাতে, সকল স্পর্দ্ধায়
নিমেষে বিচূর্ণ করি'! অধর্ম্ম-ছায়ায়
ধর্ম্মগুরু ভারতের উদ্ধার সাধন
চাহে না গোবিন্দসিংহ! লইয়া জীবন
দূর হয়ে যা রে তুই! প্রগল্‌ভা তোর
ক্ষমিলাম সব আমি!"

নিশি হ'ল ভোর
অকস্মাৎ অতর্কিতে। মুখরি' কানন
স্বভাব ঋত্বিকবৃন্দ বিহঙ্গমগণ
"জয় গুরুজীর জয়।" উঠিল গাহিয়া
মধুর ললিত-কণ্ঠে, সে তানে মাতিয়া
বননির্ঝরিণীকুল গাহিল পুলকে
"জয় গুরুজীর জয়।" দ্যুলোকে ভূলোকে
দ্বারে দ্বারে প্রভঞ্জন ধাইল গাহিয়া
"জয় গুরুজীর জয়।" নয়ন মেলিয়া
সে তানে মিলায়ে তান পবিত্র স্পন্দন
জাগাইয়ে মহাব্যোমে গাহিল ভুবন
"জয় গুরুজীর জয়।"

কত বর্ষ পরে
বঙ্গের চারণ কবি নিভৃত অন্তরে
সে মহান্ জয়ধ্বনি করিছে শ্রবণ
আত্মহারা হয়ে আজ। পুণ্য-নিকেতন
হে প্রিয় স্বদেশ মোর। গোপন আত্মায়
ধরি' লহ হেন দৃঢ় চরিত্র নিষ্ঠায়
অপূর্ব্ব এ স্বার্থত্যাগে! গাহ আরবার
নেহারি' গোবিন্দসিংহে সম্মুখে তোমার
পরম আনন্দভরে নোয়াইয়ে শির
"জয় গুরুজীর জয়! জয় গুরুজীর!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাতীয়তা।

জাতির প্রতি আত্মবৎ মমত্ব বুদ্ধির নামই জাতীয়তা। ব্যক্তির আত্মপ্রেম তাহাকে সর্ব্বদাই হৃষ্টপুষ্ট রাখিতে, আনন্দময় দেখিতে চায়। অধীনতায় সঙ্কুচিত ও মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। দশজন মানুষের মধ্যে আপন চরণের উপর দাঁড়াইয়া উন্নতমস্তকে অসঙ্কোচে যেন একজন মানুষের মত ব্যবহার করিতে পায়—দলিত পেষিত পণ্য জীবনের দুর্ব্বলতা হইতে দূরে থাকিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ফলে সম্পূজিত হয়, ব্যক্তির আত্মপ্রেম তাহাই আকাঙ্ক্ষা করে। প্রতিকূলতায় সে বাসনা প্রত্যেক ব্যক্তিরই পূর্ণ না হইলেও আত্ম-প্রেমের অস্তিত্ব লোপ হয় না। উহা ক্ষণ কালের জন্যও ব্যক্তিকে ত্যাগ করে না আজীবন সাথে সাথে থাকিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা দেয়—মুক্তির পথে টানিয়া লইয়া যায়। সুধাময়ী মুক্তির আসনে উপবিষ্ট দেখিতে চায়; তাই ব্যক্তিমাত্রেই স্বাতন্ত্র্যকামী। আত্ম-প্রেমের অভাব হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধির চিন্তা মনে উদ্রিক্তই হইত না, ব্যক্তি জীবনহীন প্রস্তরবৎ হইয়া যাইত। আত্ম-প্রেমই তাহাকে অনুভূতি সম্পন্ন করিয়াছে, তাই সে ব্যক্তি নামে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাই তাহার সর্ব্বস্ব।

মানব হৃদয়ে যখন আত্ম-প্রেমের ন্যায় জাতীয় মমতা স্থান লাভ করে; তখন জাতীয় সুখ দুঃখের চিন্তা, লাভালাভের গণনা, মানাপমানের ভাবনা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করে। জাতীয় আনন্দে আনন্দিত, জাতীয় উৎপীড়নে আপনাকে উৎপীড়িত, জাতীয় সমুন্নতিতে আপনাকে গৌরবমণ্ডিত মনে করে। জাতির সহিত নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। জাতিকে যতদিন উন্নত জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে

না পারে; ততদিন তাঁহার কর্ম্মের শেষ হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, জাতীয় বিপুল স্বার্থই তাঁহার জীবনে একমাত্র বরণীয় হইয়া থাকে। জাতীয়তার উন্মাদনায়, ত্যাগের উজ্জ্বলতায় দেশ আলোকিত ও পবিত্র করে। প্রত্যেক জাতিতেই কোন মহনীয় চরিত্র মহাপুরুষের হৃদয়ে জাতীয়তা জন্মলাভ করে। জগজ্জীবন তপন যেমন উষার অন্ধকারে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় রশ্মিমালায় অন্ধকার নষ্ট করতঃ ধরণীতল আলোকিত করিয়া মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড কিরণ বিকীরণ করেন, জাগতিক প্রত্যেক বস্তু তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করে, তেমনই জাতীয়তামত্ত মহাত্মার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাতিতে জাতীয় মমত্ব বোধ সম্প্রসারিত হইয়া জাতিকে জাতীয়তা সম্পন্ন করিয়া তোলে। তাহার ফলে জাতির প্রতি নরনারীর হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদা বোধ জাগ্রত হয়—জাতির অঙ্গবিশেষ কোনরূপ বেদনা পাইলে সেই বেদনা প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া চঞ্চলতা প্রদান করে। জাতি বা জাতির অঙ্গবিশেষের প্রতি অধিকার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা জনিত বাধা প্রত্যেকের মর্ম্ম পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ন্যায় জাতির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কামনা স্বাভাবিকরূপে হৃদয়ে হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। জাতীয়তার অকৃত্রিমতার গুণে ক্ষুদ্র জাতি ও বৃহৎ জাতির ভয়ের হেতু ও সম্মানের ভাজন হয়—'বড়'র পিরিতি তাহাকে বন্ধুত্বের আসনে বসাইয়া তৃপ্তিবোধ করে।

জাতীয়তাবর্জ্জিত ছিন্নভিন্ন জন বহুল বিরাট জাতিও হৃদয়ের দোষহীন কর্ম্মবশে একতা বিহীন মৃতবৎ জাতীয় জীবনটীকে শক্তিশালী জাতির হস্তে তুলিয়া দিয়াই আরাম বোধ করে, পদতলে পড়িয়া থাকিয়া পদ লেহন করিতেই ভালবাসে। আঘাতে সাড়া দিবার শক্তিটীও হারাইয়া ফেলে। যখন অসহ্য হয় শুধু অশ্রুপাত করে। হস্ত পদ সঞ্চালনের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত থাকেনা—মানুষের মত দাঁড়াইবার সাহস ত দূরের কথা। জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সাড়া দিবার প্রয়াস করিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া ভূতলে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেম্নি আছি তেম্নি থাকি, এই ভাবটাই তাহাদের প্রবল। সুতরাং জাতীয়তা-বিহীন জাতিমাত্রকেই সর্ব্বদা অত্যাচার অবিচারের তিক্ত আস্বাদ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—ইহাই তাহার সুনিশ্চিত কর্ম্মফল!

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, আমরা ভারতবাসী জাতীয়তা বর্জ্জিত জাতি। 'জাতীয়তা' শব্দটী অধুনা প্রায় সকলের মুখে উচ্চারিত হইলেও জাতীয়তার অনুভূতি আমাদের অনেকেরই নাই। জাতীয় মমত্ব বুদ্ধি কতিপয় মহাপুরুষের হৃদয়মন্দিরে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও অবশিষ্ট নরনারী জাতীয় মমতা পরিশূন্য ইহা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহে।

জাতির জন্য ত্যাগস্বীকারই জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ। আত্মবৎ সমগ্র জাতিকে যতদিন অনুভব না করা যায় ততদিন জাতির সুখদুঃখে মানাপমানে হর্ষ বিষাদ আসেনা। জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যক্তিত্বের সুবিধা বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মধ্যে কয়জনের সেরূপ স্বভাবের বিকাশ দেখা যায়? আমরা সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া মারামারি করি, নামযশের ভাগ লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া মরি—ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইলে সরিয়া পড়ি!

দেশাত্মবোধ সম্পন্ন কোন মহাত্মা ত্যাগের মহিমায় দেশ উদ্ভাসিত করিয়া দেশবাসীকে ত্যাগের পথে টানিয়া লইতে সক্ষম হইলে, আমরা দ্বেষবুদ্ধির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে পারিনা বলিয়া, তাঁহার কার্য্যে বাধা উৎপাদনের চেষ্টা করি—তাঁহার ত্রুটী বিচ্যুতি বড় করিয়া দেখাইয়া দেশবাসীকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে চাই। তাঁহার সবল সতেজ হৃদয়ের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ গৃহকোণে বসিয়া থাকি, কেহ কেহ বা দূর হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক ত্রেতার বিভীষণের স্মৃতি বর্ত্তমানে মানবমনে উদিত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

দেশের জন্য জাতির জন্য যাঁহারা ত্যাগী ও নির্ভীক কর্ম্মী, তাঁহাদের কর্ম্মফলে দেশের কল্যাণ, জাতীয়তাহীন দেশবাসীর প্রতিকূলতায় যত সামান্য পরিমাণেই সংসাধিত হউক, তাঁহারা তজ্জন্য শ্রদ্ধাভাজন ও ধন্যবাদার্হ। তাঁহারাই দেশবাসীর আদর্শ। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের কর্ম্মই ভারতবাসীকে মনুষ্যোচিত অধিকার প্রদান করিবে।

ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন জাতিই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন কোন জাতিরই মুক্তির পথের সন্ধান মিলে নাই। ত্যাগ মন্ত্রের উপাসনা না করিয়া কোন জাতিই ধনৈশ্বর্য্যে প্রভাব প্রতিপত্তিতে অলঙ্কৃত হইতে পারে নাই। ত্যাগই জাতির মুক্তির সেতু।

ত্যাগের মহিমা জাতীয়তার অর্থ কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছ কি? যদি না পারিয়া থাক অন্য দেশে অন্য জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইবে হৃদয়ের অযথা বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতার গর্ব্ব নষ্ট হইবে; জাতি কেমন করিয়া অধিপতি হয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জনসংখ্যাও দেশের আয়তনে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? আজ যে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি নিচয়ের সমকক্ষ? ইহা কি শুধু খাঁটী জাতীয়তার ফল নহে? জাতীয়তার প্রভাবমত্ত দেশের জমিদারবর্গ যদি তাঁহাদের স্ব স্ব সম্পত্তি জাপানরাজের পদতলে স্বেচ্ছায় ঢালিয়া না দিতেন তাঁহাদের ত্যাগের মহিমায় দেশবাসী যদি হৃদয়ে হৃদয়ে জাতীয়তার আসন প্রস্তুত না করিতেন, আজ জগৎ পূজ্য জাপান ক্ষুদ্র ও নগণ্যই থাকিয়া যাইতেন। জাতীয়তার গুণে ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়—ক্ষীণশক্তি মহাশক্তিধর হইয়া যায়।

জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিনিচয়ের অন্যতম জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য একদা বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল; একতাবর্জ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির দ্বারা শাসিত হইত। প্রতিবেশী প্রবলরাজ্য কর্ত্তৃক যখন তখন উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়া মর্ম্মপীড়া লাভ করিত। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই, যে প্রবলের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে? মহাপ্রাণ বিসমার্কের হৃদয়ে জাতীয়তার প্রদীপ্ত অনল জ্বলিয়া উঠিয়া যখন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সেই অনলে গ্রাস করিতে সক্ষম হইলেন তখন তাহাদের দুর্ব্বলতা ভস্মীভূত হইয়া আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত হইল। ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজত্ব প্রুশিয়া রাজের চরণতলে অঞ্জলী দিয়া প্রভুত্বের সঙ্কোচ সাধন করিয়া জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠন করিলেন; সেই দিন হইতেই জর্ম্মাণদেশ বিশ্বরাজ্যে গণ্য হইয়া পড়িল। প্রবলের

অত্যাচার হস্তপ্রসারণ বন্ধ করিল। জাতীয়তার অভাবে জর্ম্মাণদেশ হতমান ছিলেন; জাতীয়তার প্রভাবে জগন্মান্য হইলেন।

ফরাসীর জাতীয়তা সুবিখ্যাত। ফরাসী জাতি অকপট জাতীয়তার গুণেই সাধারণ তন্ত্র লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আজও তাহাদের মধ্যে সে জাতীয়তার কণামাত্র ক্ষীণতা উৎপন্ন হয় নাই। ফ্রান্সের প্রতি নরনারীর মধ্যে সে অকৃত্রিম জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটা সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হইবে,—কতিপয় বৎসর গত হয়, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসারের নিকট ফ্রান্সের এক গায়িকা গান গায়িতে অস্বীকৃত হয়। তাহাকে কাইসারের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সে কাইসার কর্ত্তৃক কেন গান করিবে না জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্ভয়ে উত্তর করে যে, "আলসাস লোরেণের বেদনা এখনও ভুলিতে পারি নাই।" জাতীয়তা সঞ্জাত বেদনা ও আত্মমর্য্যাদা বোধ কেমন প্রবল। এরূপ না হইলে কি কোন জাতি সমুন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ইংরাজের জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। জাতীয়তার বলেই ইংরাজ ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহতের শাসকপদে অধিষ্ঠিত। জাতীয়তার বৈশিষ্টই তাঁহাকে বিশ্বরাজ্যে অতুলন প্রভুত্বের আসন দিয়াছে। জাতির জন্য ইংরাজের মত ত্যাগী সন্ন্যাসী কে? ইংরাজ ডাক্তার বৌটন দিল্লীর সম্রাট নন্দিনীর রোগমুক্তির পুরস্কার স্বরূপ চাহিলেন—"দেশবাসীর জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।" আপনার জন্য কিছুই চাহিলেন না—আপনাকে ভুলিয়া জাতিকে ধনী করিবার উপায় করিয়া দিলেন। ইহাই প্রকৃত জাতীয়তা। এই জাতীয়তার অভাবে জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে—এই জাতীয়তার প্রেরণায় পরাধীন জাতি ও স্বাধীনতা লাভে কৃতার্থ হয়।

এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশমন্বিত বিশ্বের যেখানেই স্বাধীনতার ধ্বজাধারী স্বাধীন রাজ্য দেখিতে পাইবে; ধরিয়া লইও সেইখানেই জাতীয়তার প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে বিরাজমান। পরাধীন শ্রীহীন অপদার্থ জাতির দাসবৎ ঘৃণ্য জীবনের কারণানুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে "জাতীয়তার অভাব।

ভারতে যে কখনও জাতীয়তা বোধ ছিল না, এমন নহে। তবে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। রাজপুত জাতির জাতীয়তা গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস রচিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়ের 'জাতীয়তা' প্রবল মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যেও হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল। শিখগুরু গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণ-নির্গত 'জাতীয়তা' শিখজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত শিখজাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। পরন্তু সমগ্র ভারতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিরাট জাতীয়তা বোধ কখনও হয় নাই বলিয়াই জাতীয়তাবর্জ্জিত বিরাট আজ জাতীয়তা-মণ্ডিত ক্ষুদ্রের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে!

আজ চাই ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনে জাতীয়তার সৃষ্টি ও পুষ্টি। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত চাই বেদনার অনুভূতি। আমাদের জাতীয়তা-বোধ তেমন প্রবল নয় বলিয়াই আমরা এক অঙ্গের আঘাতে অন্য অঙ্গ মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করিতে পারি না।

পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা-কাণ্ড ও নরনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার অনাচার কাহিনী বাস্তব পক্ষেই কি আমাদিগকে তেমন ব্যথিত করিয়াছে? আমরা কি সত্য সত্যই ঐ ঘটনায় অপমানিত বোধ করিয়াছি? আমাদের ভগ্নী জননী আত্মীয় স্বজন নিহত ও অপমানিত হইলে আমরা যেরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতাম, জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ ঘটনা কি তদনুরূপচিত্ত বৈকল্য আনয়ন করিয়াছে? কোন কোন মহাপুরুষের চিত্তে জাতীয়তার জাগরণের ফলে তদ্রূপ অবস্থা আসিয়া থাকিলেও অধিকাংশের যে অনুভূতি আসে নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়।

যদি পঞ্জাবীর মর্ম্মবেদনায় বাঙ্গালী, মারাঠী গুজরাটী বা মাদ্রাজীর প্রাণে সমবেদনার অনুভূতি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আজ জাতীয়তার অনুরোধে একজন ভারতবাসীকেও অত্যাচারী গর্ব্বিত সরকারের সংশ্রবে যাইতে দেখা যাইত না। আত্মসম্মানের অনুপ্রেরণায় ও মর্ম্মবেদনার আতিশয্যে কেহই সরকারের ছায়া স্পর্শ করিত না—করিতে প্রাণ চাহিত না। কাহারও পিতাকে যদি তাহার অন্নদাতা প্রভু পদাঘাত করে, তবে সেই ব্যক্তি কি পিতার অপমানকারী প্রভুর চরণতলে পড়িয়া থাকিবার লোভ ত্যাগ করে না? পেটের দায় থাকিলেও করে—এমন অপমানটা হজম করিয়া সে চাকরী করিতে পারে না। যদি পারে, তবে সে মনুষ্যাধম—অপদার্থ।

যাহারা জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরেও সরকারের প্রদত্ত সম্মান বা অর্থের লোভে সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের জাতীয়তা-বোধ যে জাগ্রত হয় নাই; মনুষ্যত্ব যে তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই, ইহা বলিলে কি মিথ্যা বলা হয়?

তোমরা 'হামপদ্ম রায়ের গোষ্ঠী' শিক্ষার অভিমান করিতে পারে, বিজ্ঞতার বড়াই করিতে পার, জাতীয়তার ধ্বজা উড়াইতে পার, কিন্তু মানুষের মনের উপর কপটতার পোষাক পরিয়া কর্ম্মহীন জীবনের ম্লানছবি দেখাইয়া ভোগের স্বর্ণ শৃঙ্খল গলায় দোলাইয়া কখনই আসন লাভ করিতে পারিবে না।

দেশ জাগিতেছে—ইহা সত্য কথা। তোমরা শিক্ষিতবর্গ যদি জাতীয়তা সম্পন্ন হইতে তাহা হইলে তাড়াতাড়ি দেশ জাগিয়া যাইত। তোমাদের দোষের মাত্রাধিক্যই তাহা হইতে দিতেছে না।

তোমরা ওকালতী ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছ—কার্য্যকালে ২।১ জনে ছাড়িতেছে বটে, তোমরা অধিকাংশেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া জাতীয় জীবনের হীনতা জ্ঞাপন করিতেছ। তোমরা দলে দলে স্কুল কলেজ ছাড়িতেছ—দুদিন যাইতে না যাইতেই আবার দলে দলে পরিত্যক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইতেছ।

সহযোগিতাবর্জ্জন নীতির সম্মান সকল ক্ষেত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে দলিত হইতেছে। ইহার ফল এই হয়, সাধারণ জনগণ সংশয়াত্মা হইয়া পড়ে! যত বেগে অগ্রসর হয়, তত বেগ আর থাকে না।

প্রকৃত জাতীয়তা বর্ত্তমানে যত কাজ না করিতেছে; হুজুগ তদপেক্ষা দ্রুত ও অধিক কাজ করাইতেছে। হুজুগের কর্ম্মফল স্থায়ী নহে—জাতীয়তা সম্ভূত কর্ম্মফল চিরস্থায়ী ও অটল।

বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনটি ব্যর্থ হইতে দিলে ভারতের কল্যাণ অনেকদূরে পিছাইয়া পড়িবে। এ সঙ্কটসময়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভারতের জন্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মত পার্থক্য দূরে রাখিয়া জাতীয়তার অনুরোধে সকলে মিলিয়া মিশিয়া আন্দোলনটাকে সফল করিবার নিমিত্ত আত্ম-নিয়োগ করিতে না পারিলে পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

তুমি নেতা হইতে পারিলে না বলিয়া অভিমানে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না। যেই নেতা হউক না কেন তাঁহার সাহায্য করিয়া সফলতা লাভ কর, ফলভাগী শুধু নেতা হইবে না; তুমিও হইবে। জাতীয়তাবোধের অল্পতার জন্যই এইরূপ অভিমানের সৃষ্টি হয়। দেখ নাই বিগত ইউরোপের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড এস্কুইথ পদত্যাগ করিয়া স্থলাভিষিক্ত লর্ড লয়েডজর্জ্জের কেমনভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন? তোমরা হইলে কি করিতে? মন্ত্রী পরিষদের ছায়াও স্পর্শ করিতে না। তোমাদের কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, "দেশ উদ্ধার হয় ত তোমাদের দ্বারাই হউক, নচেৎ দেশোদ্ধারের কাজ নাই।" জাতীয়তার অভাবই এরূপ অবস্থার হেতু।

এখনও সময় আছে এখনও ফিরিয়া এস। প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসন কি জিনিষ তাহাও একরূপ বুঝিতে পারিয়াছ। সকলে মিলিয়া সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া জাতীয়তার পরিচয় প্রদান কর—স্বরাজ লাভ করিয়া মানুষ নামে অভিহিত হও।

স্বরাজ পাইতে চাহিলে সংঘবদ্ধ হওয়া চাই—সংঘবদ্ধ হইতে জাতীয়তার প্রয়োজন। জাতীয়তার উন্মাদনা ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফলতা লাভ করিবে না। জাতীয়তা প্রত্যেক ভারতীয় নর নারীর হৃদয়ে জাগাইয়া তোল; দেখিবে, এমন কোন বাধা নাই, যাহা ভারতের স্বরাজ লাভের অন্তরায় হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

গান।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—দাদ্‌রা।

জীবন-তরীর হালখানি এই
ছাড়িনু আজ তোমার হাতে!
যেথায় চলে চলুক্ তরী
দুঃখ-ঝঞ্ঝা বইব মাথে!
যদিই আসে ঝড়ের রাতি
ধ্রুবতারার জ্বাল্‌ব বাতি
মৃত্যু-তরণ শঙ্কাহরণ
কাণ্ডারী গো রইবে সাথে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

যিনি একপ্রকার সহায়বলবিহীন অবস্থা হইতে আত্মপ্রতিভায় বিপুল প্রতিষ্ঠা ও অসাধারণ ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি বারম্বারে আর্ত্তের বন্ধু ও ভরসাস্থল ছিলেন, যিনি অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড হইতে পরিত্রাণ করিয়া জনসমাজে "জীবন রায়" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, যাহার অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা, মুক্তহস্ত দান, সৌভ্রাত্র্য বাৎসল ও প্রীতি, যাহার অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত শ্রম, অজেয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ এবং সর্ব্বোপরি লোকোত্তর ঔদার্য্য ও ক্ষমা সকলের আদর্শ স্বরূপ ছিল, আজ তাঁহার অমর আত্মা পৃথিবীর ধূলা মাটীর মায়া কাটাইয়া ও সকল জ্বালা যন্ত্রণা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া অমর লোকে, জগজ্জননীর অমৃতময়, শান্তিময় কোলে স্থানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ জীবনের মহত্ত্ব আলোচনা ও তাঁহার অশেষ গুণরাজি অনুধ্যান করিয়া আজ তাঁহার সারবত্তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথের ৬ বৎসর বয়সের সময় আমাদিগের জননী স্বর্গারোহণ করেন। তখন আমাদিগের স্বর্গীয় পিতৃদেব পিতৃ ও মাতৃ স্থানীয় হইয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে রক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে আমি কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তাই আমাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীগণ সতত পিতৃসঙ্গে বাস করিতেন। শ্রীমানজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিশুগণের জীবন তৎকারণে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্নেহরসে কিরূপ সিঞ্চিত হইত তাহা বর্ণনীয় নহে, অনুমেয়। দশ এগার বৎসর বয়স হইতে শ্রীমানের আশ্চর্য্য প্রতিভা বিকশিত হইয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে লাগিল ১৪।১৫ বৎসর বয়সের কবিতা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ও সময় সময় পত্র হইতে পত্রান্তরে উদ্ধৃত হইতে লাগিল। ১৬ বৎসর বয়সের একখানি কবিতা পুস্তক মুদ্রিত করা হইয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণ স্পর্শে একটী গোলাপ কলিকা বিকশিত হইতেছে এই ঘটনাবলম্বনে ১৪শ সর্গ অপূর্ব্ব গীতিকবিতা তিনি ১৭ বৎসর বয়সে রচনা করেন। এইরূপে তাঁহার জীবন বসন্তের আরম্ভ তাঁহার মধুর কাকলীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীমানের প্রতিভা দর্শনে এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণের কল্পনা করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার অশ্বারোহণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হায়! অতর্কিত ভাবে কাল সন্ন্যাস রোগ আসিয়া এই সময় আমাদিগের পিতৃদেবকে ছয়দিনের মধ্যেই ইহধাম হইতে লইয়া গেল। তখন মনে হইল শ্রীমানের বিলাত যাইবার কল্পনা ত্যাগই করিতে হইবে। কিন্তু পিতৃ বিয়োগের কঠিন আঘাতের ক্লেশ আংশিক অপনোদন হওয়ায় পরেই শ্রীমান তাঁহার স্বাভাবিক আত্মনির্ভরশীলতা গুণে সাহসের সহিত, একাকী স্বয়ং তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার, খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপদেশপ্রার্থী হয়েন। মাননীয় ব্যারিষ্টার মহোদয় তাঁহার

প্রতিভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া একখানি অনুরোধ পত্র সহ শ্রীমানকে ময়মনসিংহের মহাপ্রাণ মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

মহারাজা বাহাদুরও শ্রীমানের সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিলাতের শিক্ষার ব্যয় ভারের কতক বহন করিতে সম্মত হন ও শ্রীমানকে তখনই কতক টাকা দিয়া বিদায় করেন। শ্রীমান তখনই নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাড়ী হইতে আর কিছু টাকা লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর বয়স্ক পিতৃ মাতৃহীন যুবক বা বালকের পক্ষে এই ব্যাপার কতদূর ক্ষমতার পরিচায়ক তখন তাহা বুঝি নাই—এখন চিন্তা করিয়া অবাক হইতেছি। এই আত্মনির্ভরশীলতাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। বাল্যের খেলা ধূলা ক্রিয়া কৌতুকের মধ্যে এই গুণের নিদর্শন—যাহা অনেক সময়েও দোষ বলিয়া ভ্রম হইত—তাহা লক্ষ্য করিতেছি।

বিলাতে তিনি নয় বৎসর কাল ছিলেন। যদিও তাঁহার স্বর্গীয় খুল্লতাত এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যথা শক্তি সাহায্য করিতেন এবং নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দিয়াও তাঁহার জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন তথাপি তদ্দারা এই সুদীর্ঘ বিলাত প্রবাসের ব্যয়ের অত্যাল্প অংশই নির্ব্বাহ হইতে পারিত। তিনি নিজের চেষ্টাতেই অন্যান্য মহাত্মাগণের সাহায্য লাভ করিয়া কোনরূপে ব্যয় চালাইতেন। অর্থাভাব নিবন্ধন কোন ২ দিন তিনি এক পেয়ালা চা মাত্র খাইয়া বা এক টুক্‌রা মাংস খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। যদিও তাঁহার শিক্ষকগণ সময় সময় আমার নিকট তাঁহার শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক পত্র লিখিয়াছেন—তথাপি অনাটন, অর্থাভাব নিবন্ধন তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিত। এই ভাবে তিনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া অল্পের জন্য অকৃতকার্য্য হয়েন। পরে তিনি কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিঃছাত্র রূপে অধ্যয়ন করেন ও পরিশেষে গ্রেজইন নামক আইন শিক্ষালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৯৮ সনে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। এই নয় বৎসর কাল তাঁহাকে যে কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তৎকালে বিলাত প্রবাসী কোন বাঙ্গালী পরিবার হইতে তাহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে, আপনি আমাদিগের একটা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, আপনার বিলাতের সমস্ত ব্যয়ভার আমরা বহন করিব। কিন্তু অর্থলোভে বিবাহ, তিনি কখনই অনুমোদন করিতেন না। এজন্য বিশেষ ক্লেশ অভাব সত্ত্বেও, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এই ঘটনা হইতে তাহার মতের উচ্চতা নির্ম্মলতা ও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা ব্যারিষ্টার শ্রেণীতে ভুক্ত হওয়ার জন্য যে সামান্য টাকার প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়। কিন্তু তিনি নিজের শক্তি অবগত ছিলেন, এবং তাহারই ভরসায় কোন রূপে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও একখানি বাটী ভাড়া করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ব্যবসাতে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যাভিলাষী, বিদ্যাবিলাসী ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বহু সংখ্যক গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বিলাতের এত ক্লেশের মধ্যেও তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী সংগ্রহে বিরত হন নাই। ঐ সকল গ্রন্থকারগণ তাঁহার চির সহায় ছিল, তাঁহারাই তাঁহার কষ্টে প্রবোধ

দাতা ও উৎসবের সঙ্গী ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও তাঁহাকে অবসর সময়ে নিশীথ কাল পর্য্যন্ত পড়িতে দেখা যাইত। তিনি যেমন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ছিলেন তেমনি বিচক্ষণ ও বিদ্বান ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি মাত্র একবিংশতি বর্ষ কাল কার্য্য করিয়াছেন। এই অনতি দীর্ঘকাল তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তাহার মহোন্নতি সাধন, পরিজন প্রতিপালন ও আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্য করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজদ্বারে নিগৃহীত কত বিপন্নকে তিনি সামান্য অর্থ লইয়া বা অর্থ না লইয়া উদ্ধার করিয়াছেন, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত কত যুবক তাঁহার চেষ্টায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা আজ কে করিবে? লোকলোচনের বাহিরে, তিনি কত দান করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পরিজনের প্রতি তাঁহার কি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, তাহা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাঁহার স্বর্গীয় খুল্লতাত মহাশয়ের নিকট তাঁহার অনেক গুলি টাকা পাওনা ছিল। তাহা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, গ্রহণ করেন নাই। আমি তাঁহার অগ্রজ, বৃহৎ পরিবার লইয়া যখনই অর্থাভাবে পড়িয়াছি, তখনই তিনি অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবিতে তিনি বিরত হন নাই। আমার কনিষ্ঠ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ, শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, তখন শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের অবস্থা অসচ্ছল না হইলেও শ্রীমানজ্ঞান স্বয়ং ডাক্তার রজার্স, ডাক্তার ব্রাউন প্রভৃতি ডাক্তারগণকে আনিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। তৎকালে তাঁহার যে সৌভ্রাত্র যে মহাপ্রাণতা দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা দেবদুর্লভ, মানুষের কথা কোন্ ছার। এইরূপে তিনি এই বিশ বৎসর কাল, সমস্ত ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজনের কত প্রকার সহায়তা করিয়াছেন—অকাতরে অম্লান বদনে তাহাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার, কত অর্থ ব্যয়, কত অভাব মোচন করিয়াছেন, তাহা আর কত উল্লেখ করিব। তাহা স্বজনগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। স্বার্থপরতার যুগে এই ভাবে আত্মীয় স্বজনের জন্য অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকার বেশী দেখা যায় না। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও মঙ্গলেচ্ছা রামায়ণাদি কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম, বাস্তব জীবনে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীমানের ভালবাসা সাহায্য এবং সেবা যে নিজ পরিবারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি তাঁহার নূতন সমব্যবসায়ীগণকে নিজ সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সাহায্য করিতেন। তিনি পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চ যে সকল উন্নত ভাব আমাদিগের কল্যাণকর—তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহিক য়ুরোপীয় তিনি ভাবাপন্ন বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেন—কিন্তু তাহার অন্তর সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন ছিল তিনি সুকুমার কলা ও কাব্যামোদী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষোচিত ধীরোদাত্ত, বীরত্বময় ভাব তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিত। আজকাল অস্মদ্দেশে পুত্র কন্যাগণের কত সুন্দর মনোমুগ্ধকর নাম রাখা হয়—কিন্তু তাঁহার আদর্শানুযায়ী তাহার একমাত্র পুত্রের নাম বড় সাধ করিয়া "অর্জ্জুন" রাখিয়া গিয়াছেন ক্ষুদ্র হইলেও ইহা তাহার অন্তরের নিগূঢ় দেশপ্রীতি-সূচক সন্দেহ নাই।

শ্রীমান অতি ক্ষমতাশালী ব্যারিষ্টার ছিলেন, এবং সর্ব্বদা ন্যায় পথে বিচরণ করিয়া সকলের নিকট সুনাম ও সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত নিউবোল্ড সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

"I had a great admiration for Mr Roy's abilities Mr Roy was one of the best Cross-examining Counsel that I had before me and found Mr. Roy absolutely fair in his conduct as an advocate"

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল মাতৃভূমির সেবা করা। নিজ পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা করিয়াই, অবিলম্বে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বাগ্মিতা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করিবেন, এইরূপ সংকল্প ছিল। তিনি পঠদ্দশায় বিলাতে অবস্থানকালে ভারত হিতৈষী মহা স্থবির মহামান্য স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর ভারত হিতানুষ্ঠানে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎকালে তিনি নির্ভীক চিত্তে উচ্চ কণ্ঠে "ভারত ভারতবাসীর জন্য" এই সুমহান্ রাজনৈতিক সূত্র যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা আজ দেখা যাইতেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্য কতদূর সাহসের ও অনাবিল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক তাহা এ কালে ধারণা করা সহজসাধ্য নহে।

স্বদেশের জন্য সততই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, এ জন্যই তিনি নিজ ব্যবসায়ে ক্ষতি করিয়াও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ার জন্য গত বৎসর বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিন রেল হইতে অবতরণ সময়ে, পদে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তজ্জন্য তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হয়, তাই তাহার ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তৎসময়ে, তিনি বঙ্গের রায়তগণের অভাব অভিযোগের প্রতিকার কল্পে, রায়ত সমিতি স্থাপন প্রভৃতি প্রজা হিতকর কার্য্যে বিশেষ যত্ন এবং সময় ও অর্থ ব্যয় করেন। রায়তগণ তাহাতে কতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার রোগের সময়ে, তাঁহার রোগমুক্তির জন্য, অনেক স্থলে মন্দিরে ও মস্‌জিদে দেবকার্য্য হইয়াছে এরূপ শ্রুত হইয়াছি। একজন রায়ত তাহার ক্ষেত্রের একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষুদণ্ড তাঁহারই জন্য রাখিয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা এখানে পৌছিয়াছে। একজন শিক্ষিত রায়ত প্রতিনিধি তাঁহার বিষয় যাহা আমার নিকট লিখিয়াছে তাহার কতক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—"তাঁহার অকাল বিয়োগে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা দেশবাসীমাত্রেই বুঝিতেছে। আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে, তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালার রায়ত যে সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবানের কাজ ভগবানই করিলেন; বাঙ্গালার দরিদ্র রায়ত আজ অদৃষ্টদোষে নিরাশ্রয় ও বন্ধু হীন হইল। দেশ জননীর উজ্জ্বল কণ্ঠমণি স্খলিত হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীমান তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠকে ডাকিয়া, কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "ভাই, এই যে সুন্দর বাড়ী. টাকাকড়ি, জিনিষপত্র, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র দেখিতেছ, যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন বুঝিব, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে তিলার্দ্ধ ও ইতস্ততঃ করিব না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের সহিত তাহার মতের অনৈক্য ছিল এবং তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যে দিন শ্রীমানজ্ঞান চিত্তরঞ্জনের মহাবর্জ্জনের সংবাদ শুনিলেন, তাহার পর অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আন্তরিক ও ঐকান্তিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বলিতে কি হইবে, যে বাঁচিয়া থাকিলে এই মহাপ্রাণ দেশ সেবায় নিজের সমগ্র শক্তি অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন না? কিন্তু ভগবানের আদেশ অন্যরূপ হইল, তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না।

তিনি জীবনে, মরণে একই প্রকার ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাব জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজ চিকিৎসার বিষয়ে বিজ্ঞতার সহিত উপদেশ দিয়াছেন। রোগের সে দুর্ব্বিসহ যাতনা যে ভাবে তিনি সহিয়াছেন, তাহাতে কি চিকিৎসক, কি শুশ্রূষাকারক, কি আত্মীয় স্বজন সকলেই মুগ্ধ ও অবাক হইয়াছেন।

আর অধিক কি লিখিব। কি বলিব। চূড়াহীন মন্দিরের ন্যায়, মস্তকহীন দেহের ন্যায়, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আজ এই পরিবার! কিন্তু ভাবনা কিসের? জগৎপাতা জগদীশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছেন এবং করিবেন। যে অমর-আত্মা এ পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া এই লোকে এতদিন বাস করিয়া গেলেন, তিনি অমর লোক হইতেও তাহার শিশুপুত্র এবং শোকাকুলা সহধর্ম্মিণী ও প্রিয় পরিজনগণের কল্যাণ সাধন করিবেন। আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবিচলিত থাকিতে পারিলেই, তাঁহাব আত্মীয় নামের যোগ্য হইতে পারিব এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃত প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। তাহার পর মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। তাঁহার জীবলীলা সমাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিলেন "দাদা আমি চলিলাম।" ইহাই প্রকৃত কথা, আত্মা বিনষ্ট হয় না—লোকান্তরে চলিয়া যায়। আমরাও সত্বরই সেই পথের পথিক হইয়া, পুণ্যবল থাকিলে, পুনরায় তাঁহার সঙ্গ লাভ করিব, এই আশায় আশ্বস্ত হই। জীবমাত্রেই মরণশীল, অগ্র পশ্চাৎ সকলকেই একই স্থানে যাইতে হইবে। মৃত্যু সাময়িক বিচ্ছেদমাত্র। তাহাতে মুহ্যমান না হইয়া যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ইহা ব্যতীত সান্ত্বনার আর কিছুই নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়।

বৈশাখী পূর্ণিমা।

কবি বলিয়া গিয়াছেন, "পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি বৈশাখের মাসে।" বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি পুণ্যদা কেন? সাধারণের উত্তর কি তা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। একটা বিশেষ অর্থও আছে। ভারত আধ্যাত্মিকতার জন্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসের এক অতি শ্রেষ্ঠ অংশ এই পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই তিথিতেই শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন, এই তিথিতেই তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয়,

এবং এই তিথিতেই বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। আবার গৌতমবুদ্ধ যে নিশান ফেলিয়া গেলেন, সেই নিশান ধরিয়া তুলিয়া তিনি এ দেশে আধ্যাত্মিকতার মহাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন সেই আচার্য্যশঙ্করেরও তিরোধানের তিথি এই বৈশাখী পূর্ণিমা। সুতরাং এ পূর্ণিমা যে পুণ্যদা তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। ইহার সঙ্গে বুদ্ধও শঙ্কর এই দুই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি গ্রথিত। বুদ্ধদেব মানবাত্মাকে বাহ্য আচার নিয়মের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সেই নৈতিক জীবনের স্বাধীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা না পাইলে ধর্ম্মজীবন, অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভই হয় না। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণই ধর্ম্ম, (religion) আর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠাই নীতি। (morality) নীতিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্ম আসে না। যার আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, তার আত্মসমর্পণ কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় অলীক। বুদ্ধের মধ্য দিয়া না গেলে শঙ্করে পৌছান যায় না। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন কোথায়? নীতি—স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (Free Self-determination)—ইহাই বুদ্ধভাব, ধর্ম্ম—ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ (Absolute Self abnegation in God)—ইহাই শঙ্করভাব। সুতরাং বুদ্ধ যতক্ষণ আছেন শঙ্কর আসিতে পারেন না। আবার শঙ্কর যখন আসিলেন বুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইতে হইবে। তবে উভয়কে কি আমরা একসঙ্গে অভ্যর্থনা করিতে পারিব না? ইহার অর্থ কি এই যে, মানবের নীতি ও ধর্ম্ম, Morality ও Religion একসঙ্গে অবস্থিতি করিতে পারে না? এমন তত্ত্ব (Philosophy) কি নাই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বুদ্ধ ও শঙ্কর স্বতন্ত্রভাবে কেবল ইতিহাসের আলোচ্য না থাকিয়া একসঙ্গে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারেন? সাধারণ চিন্তাবিহীন মানুষ ধর্ম্ম ও নীতিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখে না। কেন না, নীতি তাহার কাছে কতকগুলি বাহিক নিয়ম পালন, বুদ্ধদেব যাহা দুর্নীতি বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মও সাধারণ মানুষের কাছে কতকগুলি নিয়ম পালন। সুতরাং দুই দফা নিয়মপালনের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য কোন সময়েই তার চক্ষে পড়ে না। কিন্তু নীতি—যদি হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self determination) এবং ধর্ম্ম যদি হয় আত্মসম্বরণ (Self surrender) তবে এক অন্তের বিধ্বংসী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বয় কোথায়? সে মহাতত্ত্ব কি যাহার সুশীতল ছায়ায় বুদ্ধ ও শঙ্কর উভয়েই সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, কেহ কাহাকে বাধা দেন না? এই পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথিতে উভয়ের পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে, আমরা আজ সেই তত্ত্বের অনুধ্যান করি যাহার সঞ্জীবন স্পর্শে বুদ্ধ শঙ্কর একসঙ্গে আমাদের অন্তরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেব যে আত্মাকে স্ব-প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, নিয়মের জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন এবং শঙ্কর যে আত্মার অনুসরণ করিতে যাইয়া আর যা কিছু সব মায়াসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন,—এই দুই এরই সত্ত্বা স্বীকার করিয়া উভয়ের মৌলিক একত্বের (Fundamental unityর) সুস্পষ্ট ধারণাই সেই তত্ত্ব। আমরা আজ এই তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি, যাহারই মধ্যে কেবল মানবাত্মার স্বাধীনতা (Free self determination) ও তাহার ঈশ্বরাধীনতার (Self surrender to God) সামঞ্জস্য। এই তত্ত্বই কেবল আমাদের বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবকে পূর্ণতা দান করিতে পারে। নতুবা

বাহিরের উৎসব বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। উহা শঙ্কর ও বুদ্ধ উভয়েরই অবজ্ঞার বস্তু। এই তত্ত্বেই বুদ্ধ ও শঙ্করের মিলন ও মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতা।

ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে যিনি একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্করের সাধন সম্পদের সমাবেশ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও আজ স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথের পথিক না হইয়া পারিতেছেন না। তিনি বুদ্ধ ও শঙ্করের সম্মিলন ভূমি। রামমোহন বুদ্ধনীতির সার কথা মানবাত্মার স্বাধীনতার ধ্বজা লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে স্বাধীনতার সম্মুখে বাহ্য আচার ব্যবহারের জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমন মহিমাময় গৌরবমুকুটে বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, যাহার নিকটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষও মাথা না নোয়াইয়া নিষ্কৃতি পান নাই। (ইহাই আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে একদিককার স্থাপন Thesis) এই রামমোহনই কিন্তু—"কর অহঙ্কার খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈতগর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়" বলিয়া পরমাত্মসাগরে সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। (ইহাই খণ্ডণ antithesis) রামমোহনই আবার "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" এই সূত্রে বুদ্ধাত্মা ও শঙ্করাত্মার মৌলিক একত্ব (সমীকরণ Synthesis) হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবের অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণ সফলতার আদর্শ দেখাইবার জন্য নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে তিথিতে বুদ্ধ ও শঙ্করের তিরোভাব সেই তিথির উৎসবে আমাদের মধ্যে রামমোহন উপস্থিতির কল্পনায় ভাবগত (লজিক্যাল্) পৌর্ব্বপর্য্যায় ক্রমভঙ্গদোষে দোষী হইব না। বরং ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাদ্বারা সে ক্রমের অভীষ্ট নিরবচ্ছিন্নতাই রক্ষিত হইল। তাই আজ রামমোহনকেও স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না। * কিন্তু অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার সন্নিপাত (Chronological coincidence) আমি যতদূর গণণা করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রীরামমোহনের জন্মতিথি বলিয়া আমারও দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। রাজার জন্মদিন সৌর জ্যৈষ্ঠমাসে। প্রতি তৃতীয় বর্ষে মলমাসের বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে যাইয়া পড়ে। † পুরাতন পঞ্জিকার সাহায্যে গণনা করিয়া দেখিয়াছি রামমোহনের জন্ম বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ মাসেই ঘটিয়াছিল। যে তিথিতে ভারতের ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ত্রিযুগাবতারের স্মৃতি এমন করিয়া একত্র সমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে পুণ্যদা সে কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যাঁহারা রামমোহনের স্মৃতি রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন; যদি তাঁহারা রাধানগরে রামমোহন সরোবরের তীরে বৈশাখী পূর্ণিমায় রামমোহন মেলা বসাইতে পারেন তবে রাজার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যের দিক্ (Picturesque side)ও বজায় থাকে।

এখন এই সৌন্দর্য্যের দিকের কথাই বলিব। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না তাঁহাদের কাছে কি এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিধৌত নীলাকাশের কোন

---

* ১৩২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় কোন বিশেষ উপাসনায় ভাব লইয়া যখন এই প্রবন্ধ রচিত হয় তখন কেবল আধ্যাত্মিকযোগের কথাই মনে হইয়াছিল। জ্যোতিষিক কৌতূহল পরে হইয়াছিল, যদিও অব্যবহিত পরে।

† ১৩২৮ সালের পঞ্জিকা দেখিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

সমাচার নাই ? আজ লৌকিক ধর্ম্ম নিয়মে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলোৎসব। পুষ্প বাহ্যসৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আজ বাহ্যসৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া দিবার দিন—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কোলাকুলির দিন। মানবাত্মার উপর এই পূর্ণচন্দ্রের কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি আছে যাহার হস্ত হইতে সাধুমহাত্মাগণও অব্যাহতি পান নাই। এরূপ কথিত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়াই সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বাহ্যপ্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আরম্ভ এই বাহ্যপ্রকৃতিকে লইয়া। ইহাকে মায়ার বন্ধন, সয়তানের খেলা বলিয়া দূরে পরিহার করিবার উপায় নাই। এই বাহ্যপ্রকৃতিকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আনন্দ পাই, তাহাকে আপনার করা কত সহজ। ঐ সুন্দর ফুলটিকে কত সহজে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার করিয়া লই। এই বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম আমাদের সুন্দরের সঙ্গে যোগ হয়। সুতরাং এই প্রকৃতিও আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। জাতীয় জীবনধারার অভিব্যক্তিতে (প্রাচীন ঋষিগণের উত্তরাধিকার সূত্রে) শঙ্কর ‘সত্যংএর, বুদ্ধ ‘শিবং’এর আর কৃষ্ণ ‘সুন্দরং’এর বিকাশ। রামমোহণে তিনেরই সমাবেশ। সুন্দরের উপাসনায় রাজা কাহারও পশ্চাতে নহেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ নামের (Concept এর) মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই অভিপ্রেত ছিল—বিশেষভাবে এই লৌকিক ধর্ম্মের। কিন্তু লৌকিক ধর্ম্ম আপনার সে উদ্দেশ্য (mission) সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্য্যের জায়গায় তার উল্টাটাই বা সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন ! এই অনাসৃষ্টির জন্য, জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যবোধের ধারা যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দায়ী, তাহা না স্বীকার করিলে অবিচার করা হইবে। বাহ্যপ্রকৃতিকে ধরিতে যাইয়া আমরা প্রতিপদেই তাহার অতীত হইয়া পড়ি। হয় মায়া বলিয়া উড়াইয়া দি, না হয় ব্রহ্মে লীন করি, না হয় তো এক অর্থ বাহির করিয়া সেটাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দি। ঠিক সেটাকে সেইটা বলিয়া কখনও ধরি না। এক কুৎসিৎ চেহারা গড়িয়া তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বসিয়া যাই, মানুষের ধরের উপর এক হাতীর মাথা বসাইয়া দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া ফিলসফাইজ্ করিয়া আসিতেছি। ভুলিয়া গিয়াছি, সৌন্দর্য্যবোধ ফিলসফি নয়, আর্ট। সৌন্দর্য্যরসবেত্তা দার্শনিক নহেন, কলাবিৎ। চিরদিনই ‘সুন্দরং’কে ‘সত্যং’ ও ‘শিবং’এর চাপা দিয়া অগ্রসর হইয়াছি, তাই যত অনাসৃষ্টি জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না, সান্ত অনন্তেরই পাদপীঠ, অনন্তের প্রকাশরূপে সান্তকে না দেখিলে ভুল দেখা হইল। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়, অনন্ত যে একটা বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকট করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, তাহার সেই বিশেষত্বটিকে অন্য নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি না করিলে সেটাকে ভুল দেখা হইল। বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষকে দেখা হিন্দু-দৃষ্টি। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়া তাহার বিশেষত্বটিকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা গ্রীক্‌ভাব। এই গ্রীক্ ভাবের ভাবুক না হইলে যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত হয় না। যেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহা এই ভাবের দ্বারাই ফুটিয়াছে। আমরা প্রধানতঃ এই ভাবের অনুসরণ করি নাই। আমরা আমাদের দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়াই, অগ্রসর হইয়াছি। সে দৃষ্টি ছাড়িয়া জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই।

কাকের পা দুখানিকে লম্বা করিয়া ও তদনুপাতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া এক মানুষের ছবি আঁকিয়া বলিলাম ইনি বুদ্ধদেব। শরীরের অপচয়ে আত্মার উপচয় অর্থাৎ সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধের জন্য সভাষা ফিলসফিচাই, এক মল্লিনাথ অবশ্যই প্রয়োজন। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যবোধকে আমি বলিয়াছি সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সুন্দরকে আচ্ছাদন করা। সত্য ও মঙ্গলের ন্যায় যে সুন্দরেরও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলের পাদপীঠরূপে স্বীকার করিলেই চলিবে না। ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই যদি বুদ্ধদেবের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হয়, তবে তো একখানা কেতাব লিখিলেই হইত, ছবি আঁকিবার বা মূর্ত্তি গড়িবার কি প্রয়োজন ছিল। দার্শনিক কলাবিদ্‌কে স্থানচ্যুত করিয়া কলার প্রাণ হরণ করিয়াছে। আমরা দার্শনিকের চক্ষে জগৎ দেখি বলিয়া আমাদের কাব্যগুলিতেও এত দর্শন জমাট্ বাঁধিয়া গিয়াছে যে অন্য দেশের দর্শনেও এত দর্শন আছে কি না সন্দেহ। (অবশ্য, প্লেটোর Dialogues গুলি প্রধানতঃ কাব্য কি দর্শন সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন। Inge তাঁর Gifford Lectures 1917—1918, প্লেটোর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "No system can be had in his writings. He was a poet and prophet." সুতরাং আমাদিগকে কলাবিদের দৃষ্টিতেই বাহ্য জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। নতুবা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। আবার এই সুসভ্য কলাবিদের দৃষ্টিই বাহ্য জগৎকে গ্রহণ করিবার একমাত্র পন্থা নহে। সেই জন্য, একটু পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা কত ভাবে বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, তাহারই একটু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মসাধন। প্রকৃতি সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করেন না। হ্রাসবৃদ্ধি রহিয়াছে। আদিম মানব আদিতেও করিয়াছিল এবং এখনও এই বৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের সময়ে (The Season of Exuberance in nature) আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে প্রকৃতিরই মধ্যে সে আত্মলাভ করে, প্রকৃতির এই উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াই আপনাকে বিকশিত করে। সে আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে এক বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিল তাই তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রীতি ফুটিয়াছিল। বুদ্ধদেব আমাদিগকে সর্ব্বজীবে মৈত্রী শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের বিশ্বমৈত্রীক ভাব আমরা আমাদের এই আর্য্যপূর্ব্ব আদি পিতৃপুরুষের নিকট পাইয়াছি। মানুষ যতই সভ্যতামার্গে অগ্রসর হইয়াছে ততই সে প্রকৃতির ক্রোড় ভ্রষ্ট হইয়া এই সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আবার স্রোত ফিরিয়া, সহরবাসী সুসভ্য মানব, প্রকৃতির অনুকরণে সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু আদিম মানবের দানের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই যে আমাদের দোল হিন্দোল রাস পুষ্পদোল শারদীয় উৎসব সকলই তো এই প্রকৃতির অভ্যুদয়কালীন আনন্দোচ্ছ্বাস। কিন্তু আমরা এখন হইয়াছি ফিলজফার, তাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় লাগিয়া গিয়াছি। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ শকুন্তলার আশ্রম ত্যাগকালীন পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির সঙ্গে যে সপ্রেম সম্ভাষণ তাহা দেখিয়া হুইপাইকেল ও

কতকগুলি অভ্যন্তকর্ম্ম পিঞ্জরাবদ্ধ আমাদের সহরবাসী সুসভ্য আত্মাকে কি তাঁহার কাছে নিতান্তই খাট বলিয়া মনে হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজেই নিজের বিশেষ অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এখনও প্রথা আছে যে দীক্ষা গ্রহণের পর বনে প্রস্থান করে ও প্রকৃতির সঙ্গসাধনে লিপ্ত হইয়া থাকে। উপনয়নের পর আমাদেরও ব্রাহ্মণ কিছু দিন প্রকৃতি চর্চ্চায় নিযুক্ত হয়; ইহা নিশ্চয়ই সেই আদিম পিতৃপুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

তৃতীয়তঃ, গ্রীক্‌ভাবে প্রকৃতি সাধন। ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়াই তাহার সঙ্গে একত্বসাধন তাহার প্রাণ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ ও তাহার উপলব্ধি। একটি ফুল লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ ও উহারই মত সুন্দর, উহারই মত কোমল হইয়া উঠিবার চেষ্টা। হিন্দুভাবের ন্যায় উহাকে সমগ্রের মধ্যে ডুবাইয়া দিবার প্রয়াস নহে। এমন যে প্লেটো যিনি পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদের (Idealism) জনক তাঁহারও আইডিয়া (Concept) গুলি যেন কাঁটাছাটা একএকটি বিশেষ (particular) বিষয় জগতের (Objective world) এক একটি অঙ্গ। বিশেষত্বনিষ্ঠ গ্রীক্‌প্রকৃতির আওতায় (Envirnment) মধ্যে আর কিছুর আশা আমরা করিতেই পারি না। প্লেটো হিন্দু হইলে তাঁর দর্শন ঐ আকার কথনও ধরিত না।

চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্বন্ধকে আমাদের অধ্যাত্মজীবনের অভিব্যক্তির নিদর্শনরূপে দেখিতে পারি। যেমন সূর্য্যোদয়কে আত্মার উদ্বোধন স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। এখানেও প্রকৃতির বস্তুগতসত্তাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। আমরা জানি সূর্য্য উঠে, কিন্তু কয়দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি? পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূর্য্যোদয়ের মহামহিমা, সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ব্যসনের উপলব্ধি সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আগে এই ঘটনা নিচয়ের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি সঞ্চয় চাই। অন্যদিকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিরও উদ্বোধন চাই। কুজ্ঝটিকাবসানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে সপ্ততিপর বৃদ্ধকেও হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সন্দেহ-কুয়াসা-মুক্ত আত্মা জ্ঞানের আলোক দেখিয়া, যে এমনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে এই উপমার কয়জন উক্ত পরিচিত স্বভাবের শোভার মধ্যে ডুবিয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন!

পঞ্চমতঃ, সমগ্র বাহ্য প্রকৃতিকে মহাপ্রাণের এক অখণ্ড লীলা বলিয়া দর্শন। মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম বলিয়া নহে, জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া দিয়া নহে, কিন্তু ইহাকে এক জীবন্ত জাগ্রত মহাপ্রাণের বাস্তব খেলা, তাঁহার প্রাণের অভিব্যক্তি, প্রাণের তরঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রতিস্পর্শে তাহারই স্পর্শ, প্রতি দর্শনে তাঁহারই দৃষ্টি, প্রতিকর্ণে তাঁহারই শ্রুতি। তিনি ইহারই মধ্যে পূর্ণরূপে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

ইহা তাঁহারই প্রাণের খেলা। পদ্মগন্ধে তাঁরই গাত্রগন্ধানুভূতি, দাবানল দর্শনে ভগবানের বহ্যুৎসব বলিয়া হাত তালি দিয়া নৃত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তা কি অনির্ব্বচনীয় নহে? এইরূপে বাহ্য জগৎকে বাস্তব সত্তা রূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষকে উড়াইয়া না দিয়া কিন্তু তাহার বিশেষত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যদি আমরা অনন্তের অন্বেষণে ছুটি তবেই আমাদের তপস্যা আমাদিগকে পূর্ণ ব্রহ্মের চরণতলে উপনীত করিবে। অন্য কোন পথে যদি যাই জাতীয় জীবন যাহার সাক্ষ্য একাধিকবার দিয়াছে—আমরা পৌছিব গিয়া মহা শূণ্যতায়। তাই মনে রাখিতে হইবে, জগৎটা মায়ার খেলা নয়, প্রেমের লীলা।

প্রেমের গতি সৌন্দর্য্যের দিকে। তাই, প্রকৃতির গায়ে, তার মুখচোখ দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই পরম সুন্দর যে স্বহস্তে আপনার চিত্র আপনি আঁকিয়া তুলিতেছেন। তাই জগৎ সুন্দর। প্রশ্ন এই, এই বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদে ও ফুলে কি কেহ সেই সুন্দরকে দেখিলেন না? কবি উত্তরে গাহিয়া উঠিলেন—

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।

শ্রীধারেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বর্ষা গেছে

যাচ্ছে উড়ে শাদা শাদা ভাঙ্গা চোরা মেঘের গাদা
জ্বালার ঝলক্ বুকের তলায় সরে গেছে;
গর্জ্জে গর্জ্জে বর্ষা ধারা ঝরে গেছে।

লক্ষ্যহারা শূন্যপথে যাচ্ছে দূরে হাওয়ার রথে,
গাছের পাতার বিলাপ-গাথা ভুলে গেছে;
ক্ষিতির সাথের স্থিতির বাঁধন খুলে গেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের স্থান।

আমরা সর্ব্বদাই শুনিতেছি স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"। আবার ইহাও শুনিতেছি যে, "শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরিয়সী", অথবা "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"॥ আমরা বিনা বিচারে বিনা অনুসন্ধানে মানিয়া লই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত যখন বলিতেছে, "স্ত্রীলোকের বেদশ্রবণে অধিকার নাই" অথবা মনু যখন বলিতেছেন "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক্ যজ্ঞো" (৫—১৫৫), অবশ্য বেদেও ঐ কথাই আছে। কিন্তু বেদ খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা প্রতারিত হইয়াছি।

লোপামুদ্রা (১—১৭৯), বিশ্ববারা (৫—২৮), শাশ্বতী (৮—১—৩৪), অপালা (৮—৯১—৭),. ঘোষা (১০—৪০), রাত্রি (১০—১২৭), জুহূ (১০—১০৯), সূর্য্যা (১০—৮৫), যমী (১০—১৫৪), এবং শচী (১০—১৫৯), এই সকল নারী-ব্রহ্মবাদিনী বেদের ঋষি বা দ্রষ্টা,—অর্থাৎ বেদমন্ত্রের রচয়িতা বা "মন্ত্রকৃতঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত "পাষণ্ড" নাম দিয়া বৌদ্ধদিগের উপরে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন :—"জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবোর্বষতীশ্বরে। পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গঃ কলৌ যথা"॥ ১০—২০—২৩॥ "ঈশ্বর যখন বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন জলের বেগে আহত সেতু সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, যেমন কলিযুগে পাষণ্ডিদিগের নাস্তিকভাবাপন্ন শাস্ত্রের প্রভাবে বেদমাগ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।" আমরা আশা করি, পাঠক "পরের মুখে ঝাল না খাইয়া" নিজে বেদেব নিক্তিতে ওজন করিয়া স্থির করিবেন, কে ন্যায়তঃ বেদমার্গ উৎসাদনের অপরাধে অধিক অপরাধী, বৌদ্ধেরাই অধিক অপরাধী, না যাঁহারা বলিতেছেন, "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" আমরা দৃষ্টান্তরূপে প্রথমে নারী ঋষি বিশ্ববারাদৃষ্ট সূক্তটি, এবং পরে কিতব বা শূদ্র-ঋষি কবষ-দৃষ্ট সূক্ত-পঞ্চক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বিশ্ববারা বলিতেছেন :—"সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি। এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবা ইলানা হবিষা ঘৃতাচী"॥ ৫—২৮—১॥ "অগ্নি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত, তাহার তেজ আকাশের দিকে বিস্তৃত হইতেছে; উষার অভিমুখে সেই তেজ বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে। বিশ্ববারাও স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করিতে করিতে হবির্যুক্ত 'স্রুক্' (ঘৃতপ্রক্ষেপার্থ হাতা বা চামচ) লইয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে।" "অগ্নেশর্ধ * মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নানি উত্তমানি সন্তু। সং জ্যাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব"॥ ৫—২৮—৩॥ "হে অগ্নে, শত্রু দমন কর, যেন মহা সৌভাগ্য লাভ হয়, তোমার উৎকৃষ্টতম তেজ প্রকাশিত হউক। আর, হে অগ্নে, দাম্পত্য-সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।" এস্থলে আমরা দেখিতেছি, বিশ্ববারা নারী, অথচ মন্ত্ররচয়িতা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি স্বয়ং অগ্নিকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তিনি হোতা। তিনি স্বয়ং "নমঃ" বা স্তব উচ্চারণ করিতেছেন, অতএব তিনি উদ্গাতা। "হবিষা ঘৃতাচী",—তিনি ঘৃত-প্রক্ষেপক স্রুকে করিয়া হবিঃ বা হোমদ্রব্য লইয়া অগ্নিতে হোম করিতে যাইতেছেন, অতএব তিনি অধ্বর্য্যু। আবার বিশ্ববারার উপরে যজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে এস্থলে অন্য কেহ নাই, অতএব বিশ্ববারা স্বয়ংই তাঁহার কৃত এই যজ্ঞের ব্রহ্মা। পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান। "ত্রয়ী" অর্থাৎ—"বেদে স্ত্রীলোকের অনধিকার" বলাতে কি 'শ্রীমদ্ভাগবত', "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক্ যজ্ঞঃ" বলাতে কি 'মনু-সংহিতা', বেদমার্গ উৎসাদনের অপরাধের অপরাধী হইতেছেন না?

আর একটী মহামূল্য তত্ত্বরত্ন আমরা কবষ-দৃষ্ট সূক্ত হইতে লাভ করিতেছি সেটি কি? মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ভৃগু বলিতেছেন "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং," অসৃজৎ ব্রাহ্মনানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা

"শৃর্ধ প্রসহবে" পা।

প্রজাপতীন্‌,” “হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ” (১৮৮—১০, ১, ৩)। মহাভারতের মতে ভীষ্মের সাক্ষ্য মতে শূদ্রেরাও দ্বিজ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পুণ্ড্র শবর-মূতিবা ইত্যাদি অন্ত্যজেরা ও বিশ্বামিত্রের সন্তান—“বৈশ্বামিত্রজ দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ” (৭—৩—১৮)। বেদের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকাতে, আমরা এতকাল বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মন “মুখবাহূরূপদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়ৎ ”(মনু, ১—৩১)। আমরা শান্তিপর্ব্বে প্রকাশিত তত্ত্বরত্নের সমাদর করি নাই। কবষ-দৃষ্ট সূক্তে আমরা সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছি যে, বেদে সর্ব্বে বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ,” নিত্য “দ্বিজায়েঃ,”—শুধু—তন্ত্রোক্ত ভৈরবী চক্রে নয়। হায়, বেদ মার্গের নামে দেশ এতকাল কত শয়তান সেবাই না করিয়াছে! ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ইলুষের পুত্র কবষ একজন বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি, এবং সেই কবষ “দাস্যাঃপুত্রঃ কিতবোঽ ব্রাহ্মণঃ।” কবষ দৃষ্ট সূক্তে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, দাসী পুত্র অব্রাহ্মণ কিতব কবষ একজন ঋগ্বেদীয় ঋষি, ঋগ্বেদের পাঁচটি সূক্তের রচয়িতা বা দ্রষ্টা। সুধু তাহা নয়, বেদে দেখা যায়, এই দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ, কিতব (জুয়ারি), রাজা কুরুশ্রবণের যজ্ঞের ‘ঋষি’ বা মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি রাজা মিত্রাতিথিরও ‘বন্দিতা’ বা স্তোত্র-রচয়িতা। (১০—৩৩—৪, ৭)। কবষ বলিতেছেন, “কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবং। মংহিষ্ঠং বাঘতাং ঋষিঃ বা মন্ত্রদ্রষ্টারূপে ত্রসদস্যুর পুত্র মহাদাতা “আমি ঋষি কুরুশ্রবণের নিকটে স্তোত্র-গায়ক ঋত্বিক্‌দিগের জন্য ধন প্রার্থনা করিতেছি।” তিনি রাজা মিত্রাতিথির পুত্রকে, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া, বলিতেছেন, “অধি পুত্রো পমশ্রবো নপান্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা”—“হে আমার পুত্রস্থানীয় মিত্রাতিথির পুত্র উপমশ্রব, আমার নিকটে এস। আমি তোমার পিতার স্তোত্র-রচয়িতা।” সুধু তাহাও নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এই অব্রাহ্মণ দাসীপুত্র কবষের দৃষ্ট “প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু অপো অচ্ছা”, “(গাতু) গমনশীল সোম (ব্রহ্মণে) স্তোত্রের সহিত (দেবত্রা) দ্যোতমান জলের নিকটে (প্র এতু) ভালরূপে গমন করুক’ ইত্যাদি সূক্ত (১০—৩০) ব্যবহার করিয়া, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞকারী অভিজাত্যাভিমানী (ব্রাহ্মণ) ঋষিগণ—“অপাং প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছন্‌” (ঐত ২—৩—১৯) ‘জল দেবতার প্রিয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।’ হায়, শঙ্করাচার্য্যের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী মহাপুরুষও কি না নিতান্ত বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলিলেন :—“যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনভিক্লিপ্তঃ ইতি তন্ন্যায়পূর্ব্বকত্বাৎ বিদ্যায়ামপি অনবক্লিপ্তত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ”—(ব্র-সূ, ১—৩—৩৪) “শূদ্রের যজ্ঞে অনধিকার যখন ন্যায় সঙ্গত, তাহাতেই শূদ্রের বিদ্যাতে অনধিকারও প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ ন্যায় সর্ব্বত্র সাধারণ।” লোক সকল পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ, আমাদের কৃত বাখ্যাতে বিশ্বাস করিবে না” (২—১—১) এই ভয়ে কি শঙ্করও এমন বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলিলেন? অথবা বৌদ্ধ সময়ে মূল বেদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এজন্য মূল বেদ বা ত্রয়ী সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যেরও কোনরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না। “ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ” (মনু, ২—১৩), “বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং” মনু, (১২—৯৪), শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও বলিতেছেন, “বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে।” ২—১—১॥ এমন কি জৈমিনি পর্য্যন্ত তাঁহার মীমাংসাসূত্রে সূত্র করিতেছেন, “বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ”

(১—৩—৩) "শ্রুতি বিরুদ্ধা স্মৃতিরপ্রমাণং" (শবর ভাষ্য)। "বেদবিরুদ্ধ কথা আদরের অযোগ্য—শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিপ্রমাণ নয়"। বেদ আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণিস্বরূপ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবুও কি সেই সাক্ষাৎদৃষ্ট বেদমার্গ অদ্যাপি কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে? কবষ-দৃষ্ট এই স্তক্তপঞ্চক ভারতমাতার নয়নমণিস্বরূপ। বেদের প্রচার হইলে কবষের দৃষ্টান্ত নিশ্চয় ভারতবাসীদিগকে নূতন চক্ষু দান করিবে, এই বিনাশোন্মুখ হিন্দু জাতিকে—Dying Raceকে"—প্রকৃত বেদমার্গ প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর অপরাপর জীবিত জাতি সকলের ন্যায়, প্রকৃত জীবন্ত জাতীয়তার সোপানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবে।*

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

সাঙ্খ্য বেদান্ত ও শাক্তাগম।

সাঙ্খ্য, বেদান্ত এবং আগম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একভাবে দেখিতে গেলে একই। সাঙ্খ্যের পুরুষ কেবল সাক্ষীচেতা; বেদান্তের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দম্ এবং আগম শাস্ত্রের শিবশক্তি ও সচ্চিদানন্দ পদ বাচ্য। যিনি তত্ত্বানুন্বেষী, তাঁরই মনে একটা ধোঁকা হয় যে, জীবমাত্রেই সর্ব্বদা দ্বৈতের রাজত্বে বাস করে অথচ দ্বৈতাতীত হবার কোন উপায় আছে কি ন এবং উপায় থাকিলেও দ্বৈতাতীত অবস্থা সত্য কি না? এই সংশয়ের বা ধোঁকার সামঞ্জস্য অতি কঠিন। অনেক সময়ে যে ব্যক্তি যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, সে সেই ভাবে উপলব্ধি করে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে, বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে মূলতঃ কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। যদিও সাঙ্খ্য বলেন যে, পুরুষ কেবল সাক্ষীচেতা সে পরিণামী নয়। তাহার কোন পরিণাম হয় না অর্থাৎ ইংরাজী কথায় He is pure consciousness। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে অহম্ এবং ইদম্ ইংরাজি কথায় I and this ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। তবে অহম এবং ইদম এই দুই বাক্যের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইবে? সাঙ্খ্য বলেন যে, প্রকৃতি অথবা প্রধান জড়, পরিণামী এবং পুরুষের ভোগের জন্য সে পরিণাম পুরুষের সংস্পর্শে পরিণামী।

ভাবিয়া দেখুন যে পুরুষ যদি না থাকে তাহা হইলে সে পরিণামের দর্শক কে? যদি কলে নাট্যাভিনয় হয় (Theatrical performance by a mechanical process) এবং সেই অভিনয় দেখ্‌বার কোন দ্রষ্টা বা শ্রোতা না থাকে, তাহা হইলে সে অভিনয়ের সার্থকতা কি? সাঙ্খ্য বলেন জড় প্রকৃতি পরিণামশীলা, নৃত্যময়ী, নর্ত্তকী আর দর্শক পুরুষ, এই দুয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হয়! যে জড়, সে ত জড় আছে ও থাকিবে। যে দর্শক এবং শ্রোতা, সে ত দর্শক এবং শ্রোতা আছে ও থাকিবে। এই দুয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব। সাঙ্খ্যদর্শন এই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য, এই প্রকারে একটা উদাহরণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা রক্তজবা কুসুম ও স্ফটিকমণি। জবাকুসুম স্বভাবতঃ রক্তিম, স্ফটিক স্বভাবতঃ শুভ্র। দুয়ের যখন সান্নিধ্য হয় স্ফটিক ও রক্তিম দেখায়। সেই প্রকার জড় প্রকৃতির' সান্নিধ্যে, পুরুষ দর্শক এবং শ্রোতা হইয়া প্রকৃতির পরিণাম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট' হন। কিন্তু যদি পুরুষ বিময় হয় এবং প্রকৃতি জড় হয় তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি করিয়া হইতে

---

* লেখকের [illegible] নামক গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

পারে ? অতএব আমার বক্তব্য এই যে সাঙ্খ্য দ্বৈতবাদী হইলেও সেই দ্বৈতবস্তুকে রক্ষা করিতে গিয়া একটা বিষম বিভ্রাটে উপনীত হইয়াছে কিন্তু সাঙ্খ্যের প্রাধান্য এই যে সাঙ্খ্য পুরুষ কেবল চেতাসাক্ষী স্বীকার করায় চিৎ (pure consciousness) স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকার করিয়া জগতের অহম্ ও ইদম্ এই দ্বৈতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলের গ্রহণীয় হয় নাই। কিন্তু যখন প্রকৃতি এবং পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, তখন দেখিতে হইবে যে, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীবের দ্বৈতভাব কিসে হইল, তৎসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন সেটা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ mysterious. এখন দেখা যাক বেদান্ত শাস্ত্র কি বলে এখানে আমি শঙ্করাচার্য্যের যাহা অভিমত তাহাই গ্রহণ করিয়া দু চার কথা বলি। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে শ্রুতির মহাবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রক্ষা করিতে গেলে "একমেবাদ্বিতীয়ম" তো স্বীকার করিতেই হইবে। তবে জগতে যে অহম এবং ইদম I and this এই যে দ্বৈতভাব কোথা হইতে আইসে। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে, এটা "মায়াবীজোদ্ভুত" এটা মিথ্যা। ইহার কোন পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল মায়া কি ? তিনি বলিলেন মায়া সৎ (সত্য) নয় (not real) অথচ মায়া অসৎ (অসত্য) নয় (not unreal) এবং মায়া সদসৎ নয় not partly real and not partly unreal) তবে মায়া কি ? তিনি ব্রহ্ম সাপেক্ষ তিনি মিথ্যাভূতা সনাতনী Eternal falsity জগতে যে দুই দেখি অর্থাৎ অহম এবং ইদমের যে পার্থক্য করি সেটা ভ্রান্তি (Ignorance) ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাঠকগণ দেখিবেন যে বেদান্ত শাস্ত্র এক চিন্ময় বস্তু অথবা সম্বিৎ (pure conciousness) ছাড়া গ্রহণ না করিলেও একবস্তু দুইভাবে প্রকটিত কেন হয় তাহার বিচার এই যেমন সাঙ্খ্য গোঁজামিল দিয়াছেন, বেদান্ত ও সেই গোঁজামিল দিতেছেন এবং বলিতেছেন ইহা অনির্ব্বচনীয় (not explainable in our terms of logical duality) এখন দেখা যাক আগম শাস্ত্র কি বলেন। আগম শাস্ত্র বলেন শিব নিষ্কল, নির্গুণ, এক পরম সত্ত্বা, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি চিৎ (pure consciousness) কিন্তু তিনি শক্তিমান। তিনি এবং তাঁর মহাশক্তি এক। তিনি বিভু এবং শক্তিমান অতএব তিনি তাঁহার শক্তিবলে পূর্ণও থাকিতে পারেন অথচ পূর্ণ থাকিয়াও লীলার জন্য শক্তি আচ্ছাদন করিয়া আবরণ করিয়া তাঁহার পূর্ণত্বে হ্রাস করিয়া এক হইলেও, দুই হইয়া, বহু হইয়া নিজের অসীম শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া জগতে বহুত্ব স্থাপন করেন অথচ তাহাতে তাঁহার পূর্ণত্বের একত্বের, কোন হ্রাস হয় না। আগমশাস্ত্র বলেন যে ইহা সত্য, কিন্তু সে সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনার দরকার। ইহাতেও দাঁড়াইল এই যে, একই বস্তু দুই হইয়া, বহু হইয়া, কেন প্রতীয়মান হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, সাধনার দ্বারা সেই বস্তু যাহা একই অথচ দুই, বহু, কেন হয় তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বাক্যের দ্বারা সে জড়তত্ত্ব (mystery) গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। অদ্য আমার শেষ বক্তব্য এই, যে, শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক, সে আলোচনা জ্ঞানলাভের এক প্রধান উপায়। - কিন্তু যথার্থ জ্ঞান, সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। আর

প্রত্যেক জীবকে করিতে হইবে। যিনি সে সাধনা করিতে প্রস্তুত নন, তিনিই এক সৎবস্তু দ্বিধা হইয়া, বহুধা হইয়া কেন প্রতীয়মান হয় তাহা জানিবার অধিকারী নহেন।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

আরোগ্যের রহস্য।

আট বছরের একটি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় শিশু, অসুখে পড়িয়া তাহার বন্ধুকে জানাইলে, বন্ধু নিজের পিতাকে, পিতা প্রতিবেশী এক বৈদ্যকে, ও বৈদ্য এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে আনাইয়া শিশুটিকে রক্ষা করিলেন।

এখানে শিশুটির রোগমুক্তির মূলে ছিল কি? তাহার আরোগ্য লাভের আন্তরিক ইচ্ছা। মানুষ সহজে পরাধীনতা চাহেনা, হয়ত সে নিজের বন্ধুকে জানাইবার পূর্ব্বে আপন বুদ্ধিমত কিছু চেষ্টাও করিয়া থাকিবে। তাহার বৈফল্যেই, বোধ হয় তাহার বন্ধুকে সংবাদ দেওয়া। মানুষ সহজে নিজের বাহাদুরী ছাড়ে না, বন্ধুও হয়ত নিজের বুদ্ধি মত কিছু একটা পরামর্শ তাহাকে দিয়া থাকিবে,—সে হয়ত সেই পরামর্শ মত চলিয়া ফল পায় নাই। বন্ধু তখন নরম হইয়া, সম্ভবতঃ কিছু বিপন্ন বোধ করিয়া, পিতাকে জানাইয়াছিল। তিনিও যে নিজের বিদ্যা চালাইয়া, দীনহীন শিশুটিকে বিনা খরচায় বাঁচাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই,—এমন বোধ হয় না। বিফল হইয়াই হয়ত শেষে বৈদ্যকে ডাকাইয়াছিলেন। প্রথমে অবশ্য অল্পে কাজ সারার চেষ্টা,—তাহারই বৈফল্যে শেষে বড় চিকিৎসকের আগমন ও রোগীর আরোগ্য লাভ।

বাহ্যতঃ ব্যাপারটি এইরূপই বটে;—কিন্তু ভিতরে আরও কিছু আছে। সেই সহিষ্ণু শিশুটি নিজ বন্ধু হইতে বৈদ্যপর্য্যন্ত সকলেরই চিকিৎসার অত্যাচার কেবল যে নীরবে সহ্য করিয়াছিল তাহা নহে,—তাহাকেই নিজের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জানিয়া একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, এবং পথ্যাদি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সংযম রক্ষা করিয়াছিল। প্রথমটি না থাকিলে তাহার উপর কাহারই সহানুভূতি হইত না, সংযম না থাকিলে ঐ সহানুভূতি-জাত সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইত। ফলতঃ রোগমুক্তির মূলকথা শ্রদ্ধা ও সংযম। যাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহা সে আপনা হইতেই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভিষক-ভেদে ও অসুখটির অবস্থা ভেদে যে নানারূপ ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল,—তাহাকে সে উপদ্রব মাত্র বোধ না করিয়া ধীরভাবে পথ্যাপথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

ঐ রোগমুক্তির ন্যায় সকল মুক্তিরই সাধনপথ একরূপ। যাহা মঙ্গল বলিয়া বোধ হইবে, নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিলে সত্যের পথ উন্মুক্ত হয়,—সাধক স্তর হইতে স্তরান্তরে নীত হইয়া অবশেষে বুদ্ধপদ লাভ করেন। ভগবান তাঁহার জীবকে নিরাশ্রয় রাখেন নাই, তাহার মধ্যে যে সত্য বুদ্ধিটুকু ক্ষীণ ধারায় অবিরতই প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই মর্য্যাদা যদি সে [illegible] রক্ষা করিতে পারে; তাহাই অবশেষে তাহাকে মোক্ষপদবীতে উত্তীর্ণ

করিবে,—স্বল্পমপ্যস্যধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। Mission (ব্রত) ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র, সত্যপন্থার অনুসরণ করিলে—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানেই যে নিম্নস্তরের তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে তাহারই অনুসরণ করিলে—ক্রমশঃ সত্যের মহত্তর মূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে প্রকাশিত হয়, হয়ত শেষে তিনি সেই Missionএর সন্ধানও লাভ করেন। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন,—কারণ তাঁহার যাহা Mission তাহা ভাগবত কর্ম্ম ত বটেই, তাহার উপর সেই বিশেষ mission—সেই বিশেষ ভাগবত কার্য্যের নায়ক তিনি স্বয়ং,—সেখানে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী সকলেরই আসন তাঁহার নীচে, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই missionএর সন্ধান যে সকল সময় পাওয়াই যায় তাহা নহে,—যে দীর্ঘ সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করা যায় মানবের আয়ুষ্কাল হয়তো তাহার তুলনায় অতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং mission হয়ত ঠিক বুঝাই যায় না,—কিন্তু একথা ঠিক, যদি কখন বুঝা যায়, তাহা এই সত্যসাধন দ্বারাই বুঝা যায়,—অন্যথা নহে। পরকাল তত্ত্ব জানিনা, কিন্তু জীবনান্ত কালের পূর্ব্বে এই mission এর সন্ধান পাইলেও সাধকের কার্য্য সিদ্ধি হয়। সেই ব্রত নিজের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে আর হয়ত তাঁহার সময় থাকে না,—কিন্তু তিনি অপরের হৃদয় ক্ষেত্রে উহার বীজ রোপণ করিয়া যাইতে পারেন। হয়ত বহু সাধনের ফলে তিনি যে সত্য লাভ করিলেন তাহা কোন শৈশবের Copybookএ লিখিত ছিল, কিন্তু এভাবে কুড়াইয়া পাওয়া ও সাধনায় পাওয়া একবস্তু নহে,—সে জিনিষে প্রাণ নাই, ইহাতে আছে। নাম প্রচার অনেকেই করেন,—কিন্তু গৌরাঙ্গের মত 'দন্তে তৃণ করিয়া' ও 'আমায় কিনিয়া রাখ' বলিয়া প্রচার খুব কম লোকেই পারে। 'নাম' যে তাঁহার বহু সাধনার সিদ্ধি 'নাম' যে তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাহার প্রচার কেবল মুখের ভাষায় নহে,—চোখে মুখে ভাবে ভঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র চৈতন্য যেন তাঁহার প্রচারের ভাষাকে সবল ও অপরাজেয় করিয়া তুলে। যে সাধক সমস্ত জীবনের চেষ্টার পর জরাজীর্ণ অবস্থায় নিজব্রতের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁহার ও পক্ষে পর কালের দোহাই দিবার প্রয়োজন হয় না,—পরকালে এই ব্রত তাঁহারই দ্বারা আবার প্রচারিত হইবে বলিয়া আত্ম প্রবোধ দানের প্রয়োজন তাঁহার হয় না, কারণ এই জীবনেই যে কয়টা দিন বাকি থাকে তাহারই মধ্যে তিনি বহু ব্যক্তিকে অভাবে জনকতককেও সেই ব্রত দান করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সানন্দে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার ব্রত উদ্যাপন করিয়া দিবেন। দ্বাদশটি মন্ত্র শিষ্যের উপর ভার দিয়া খৃষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন, আজ খৃষ্টধর্ম্ম (ইউরোপ বলিতেছিনা) জগজ্জয়ী। কাহার, ব্রত কে সাঙ্গ করে কে বলিবে? মানুষ ত যন্ত্র মাত্র, Linotype এর অক্ষর গুলির চিন্তাশক্তি থাকিলে নামিবার সময় মানুষের মতই তাহারা অবসর বোধ করিত ও হতাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু যন্ত্রী তাহাদের প্রত্যেকটিরই জন্য—এক এক স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—তাহারা বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না, সকলেই শৃঙ্খলার মধ্যে আসিয়া একটি অর্থপূর্ণ নূতন বস্তু গড়িয়া তুলে। মানুষও সেই অক্ষর,—কেবল সচেতন এমন কি কেহ কেহ যন্ত্রীর কল কৌশলের পর্য্যন্ত সমাচার রাখে,—তাহারা সহস্র পতনের মধ্যেও নিজে লীলাময়ের কোলে আছে জানিয়া ভয়শূন্য, ও তাহাদের একমাত্র কার্য্য এই অভয়বার্ত্তা ঘোষণা করা—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

এত গেল উদ্‌যাপনের কথা। কিন্তু ব্রত যাহাদের সাঙ্গ হয় নাই, এমন কি সাঙ্গ হইবার কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই,—যাহারা ব্রতের সন্ধান পর্য্যন্ত পায় নাই বা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিয়াছে,—তাহাদের জীবন কি নিষ্ফল? তাহাদের সাধনা কি নিরর্থক? মোটেই নয়। সাধনাই সিদ্ধি, সাধনাই সিদ্ধির স্বরূপ। যদি কেহ একান্তভাবে সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার মুক্তি। সৃষ্টি হইতে লয় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ যাত্রার মধ্যে কোন্ জীব যে কোন্ জায়গায় পড়িয়া আছে তাহা কেহই জানে না। যে স্তরকে আজ সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা আবার উচ্চতর স্তরের সংবাদ দিবেন। কর্দ্দমাক্ত বৃষ আজ সৌখীন অশ্বত্বের জন্য লালায়িত। স্তরের যখন শেষ নাই,—উর্দ্ধগতির যখন একটি চরম সীমা নাই, অন্ততঃ সে সীমা যখন দৃশ্যমান নাই,—তখন বিশ্রাম কোথায়, শান্তি কোথায়? ক্রমোন্নতি কথার কথা, মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। শেষ নাই,—ভবিষ্যৎ নাই, বর্ত্তমানই সব,—বর্ত্তমানের চেষ্টাই যেমন একমাত্র নির্ভরযোগ্য সামগ্রী, তেমনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই আমাদের মুক্তি;—যিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তিনি আজন্ম মুক্ত।

এত সবলের কথা। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল? যাহারা প্রকৃতই দুর্ব্বল তাহাদের বড় বিপদ, কারণ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দুর্ব্বলতা ক্ষুদ্রতার সেবা মাত্র ,—যেখানে দেখিবে মানুষ অতি অল্প পাইয়াই স্ফীত হইয়া উঠিল সেইখানেই সে দুর্ব্বল , যেখানে দেখিবে অল্প ত্রুটি কেহ মার্জ্জনা করিতে পারিতেছে না—সেইখানেই জানিবে সে নিজে অল্পপ্রাণ। এ সকলের মূলে আছে ক্ষুদ্র সন্তোষ, ভূমার উপেক্ষা, অহঙ্কারের প্রাবল্য। অহং বুদ্ধির অধিকার কমাইতে হইবে। যে কেবল শরীরে দুর্ব্বল, তাহার জন্য চিন্তা নাই। সে ত অপরকর্ম্মীকে ভালবাসিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে পারে। তাহাদের কার্য্যই তাহার কার্য্য, অন্ততঃ তাহাতেই তাহার সুখী হইবার অধিকার আছে। দুঃখী সেই যে নিজেও পারে না এবং অপর যে পারে তাহাকেও আপন বলিয়া বোধ করে না।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

কঃ পন্থা?

কোথা যাব, কোথায় যাইতে চাই, তার ঠিকানা না করিয়াই পথের কথা তোলা উদ্ভট, স্বীকার করি। কিন্তু, বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনাতে উপায়টা উদ্দেশ্য অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের নূতন আইন কহিতেছেন যে, বৈধভাবে এবং নিরুপদ্রবে স্বরাজ-লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। স্বরাজটা চরম লক্ষ্য নহে। যদি তথাকথিত বৈধ উপায়ে ও নিরুপদ্রবে এই স্বরাজ মিলে, তবেই তাহাকে বরণ করিয়া লইব। অন্যথা, এই উপায় ব্যতীত স্বরাজলাভ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বরাজকে বর্জ্জনই করিয়া যাইব। মানুষ যাহাকে চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকে কোনও দিন এরূপ ভাবে উপায় বিশেষের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে যায় না। নাগপুরে যখন এ বিষয়ের আলোচনা হয়,

তখন কেহ কেহ এ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিয়াছিলেন, আমরা স্বরাজ চাই, ইহা আমাদের চরমলক্ষ্য, যখন যে উপায় এই লক্ষ্যলাভের জন্য সমীচীন মনে হইবে, তখন সেই উপায়ই অবলম্বন করিব। আগে হইতে কোনও উপায় বিশেষকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় করিয়া চলিব কিরূপে? কিন্তু এ কথা কর্ত্তারা কাণে তুলিলেন না। এমন কি স্বরাজ বলিতে কি বুঝিব, তাহা পর্য্যন্ত আজিও ভাল করিয়া খুলিয়া বলা হয় নাই।

(২)

স্বরাজ কথাটা আমাদের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে পোনর বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় দাদাভাই নাওরোজী সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের লোকে স্বরাজের একটা মোটামুটী অর্থ করিয়া লইয়াছিল। সে অর্থটা এখন ঘোলাইয়া গিয়াছে। গান্ধী মহাত্মা স্বরাজ অর্থ কখনও রাম-রাজ কহেন, কখনও ধর্ম্ম-রাজ কহেন, কখনও "বৈরাজ" বোঝেন;—অর্থাৎ সমাজের এমন একটা অবস্থা বোঝেন, যে অবস্থাতে কোনও প্রকারের বাহিরের শাসন প্রয়োজন হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নির্ম্মল ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কাহারও উপরে কোনও রূপ উপদ্রব না করিয়া, স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। সমাজের এই অবস্থায় রাজাও থাকিবে না, রাজ-দণ্ডও থাকিবে না। সিপাহী-সান্ত্রী, পুলিশ-পাহারা, আইন-আদালত—মানুষকে বাঁধিবার ও শাসাইবার জন্য কোনও কিছুর প্রয়োজন হইবে না, কোনও কিছু থাকিবে না। ইহারই নাম না কি "বৈরাজ"। গান্ধী মহাত্মা এই "বৈরাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁহার ইণ্ডিয়ান হোম-রূল (Indian Home Rule) নামক পুস্তকে স্বরাজের এইরূপ আভাষই পাওয়া গিয়াছে। আবার কখনও কখনও স্বরাজ-অর্থে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে যেরূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত, তাহাও বুঝাইয়াছেন। কখনও বা পার্লেমেণ্টের বা প্রজা-প্রতিনিধি-সভার দ্বারা পরিচালিত শাসনকেও স্বরাজ কহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথা তাঁহার পুঁথি-পত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিতে হয়। সচরাচর তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশে স্বরাজ কথার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে তিনি স্বরাজের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতেও একটা পরিষ্কার আদর্শের ধারণা জন্মে না। কারণ, রামরাজ বা ধর্ম্মরাজ, আর প্রজা-প্রতিনিধি-সভার উপরে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসী (democracy), এক বস্তু নহে। এ সকল নানাকথার উপরে আবার সম্প্রতি তিনি খিলাফত ও স্বরাজকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বক্তৃতা করিতে যাইয়া কহিয়াছেন—"খিলাফতই স্বরাজ, স্বরাজই খিলাফত"। এ কথার অর্থ যে কি, প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝা অসাধ্য। মুসলমানের পক্ষে এক অর্থে খিলাফত ও স্বরাজ এক হইতে পারে। কিন্তু যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের স্বরাজের সঙ্গে খিলাফতের কি যে সম্পর্ক থাকিতে পারে ইহা কল্পনা করাও অসাধ্য। এ ত গেল মহাত্মার নিজের কথা। তাঁহার আসন্ন-শিষ্যেরা মাঝে মাঝে স্বরাজের যেমন ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে বিষয়টা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। স্বরাজ যে একটা রাষ্ট্রীয় বস্তু বা আদর্শ, রাষ্ট্রীয় শাসনের একটা বিশেষ ব্যবস্থা, কেহ কেহ ইহা পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। ইঁহাদের কথায় স্বরাজ বাহিরের বস্তু নহে, ভিতরের বস্তু; অন্তরে ইহা লাভ করিতে হয়। এই সকল

নানাকারণে কোথায় যে আমরা যাইতে চাই, আমাদের গন্তব্য কি, এই মূল প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা অবান্তর হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মের কোলাহলের ভিতর দিয়া ফলাফলের ভাবনা মাথা তুলিবার অবসর পাইতেছে না। চারিদিকে কেবলই শুনিতেছি—এটা কর, ওটা কর ইহা দাও, উহা ছাড়, তাহা হইলেই এতদিনের মধ্যে স্বরাজ মিলিবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিজ্ঞলোকেও কোথায় যাইতেছি, ইহা বিচার না করিয়াই এ সকল আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন।

(৩)

এই ব্যস্ততার অর্থ কি ? দেশের লোকে বর্ত্তমান অবস্থাতে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা দ্বারা এই কথাটাই অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়। রোগের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন লোকে যেমন দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যাহা কহে, তাহাই করিতে যায়, আমাদেরও প্রায় সেইরূপ দশাই উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ লোকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। যাহারা স্বল্প-বিস্তর লেখাপড়া শিখিয়াছে, এবং সাময়িক পত্রাদি পড়িয়া যাহাদের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, তাহারা অন্যদেশের লোকের তুলনায় নিজেদের অবস্থার হীনতা উপলব্ধি বা অনুমান করিয়া, এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ও শিক্ষিত লোক সকলেই বর্ত্তমান বিদেশী শাসন-ব্যবস্থাকে নিজেদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বলিয়া ভাবিতেছে। সুতরাং এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ হইলেই, তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া এই গভর্ণমেণ্টকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এ কথাটা গোপন করিয়া কোনও ফল নাই। এই গোড়ার কথাটা না বুঝিলে রাজা ও প্রজা কেহই এই আসন্ন বিপ্লবতরঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। স্বরাজ বলিতে দেশের লোকে কিছুই এখনও ভাল করিয়া বোঝে না। অনিচ্ছা বা অক্ষমতানিবন্ধন, যে কারণেই হউক না কেন, তাহাদের নেতৃবর্গও জনসাধারণকে স্বরাজের সত্য অর্থ ভাল করিয়া বুঝান নাই বা বুঝাইতেছেন না। স্বরাজ-লাভে আর কি হইবে বা না হইবে, দেশের লোকে ইহা জানে না, বুঝে না, ভাবে না। তাহারা এইমাত্র জানে, বুঝে ও ভাবে যে এই স্বরাজ আসিলে বর্ত্তমান ইংরেজ রাজ আর থাকিবে না। আর ইহাই আপাততঃ কি বিজ্ঞ কি অজ্ঞ বহুতর লোকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছে। অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রতীকার কি ?

(৪)

দেশের লোকের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহারা পথ বিপথ বিচার করিবে কি না সন্দেহের কথা। গভর্ণমেণ্ট যদি কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেন, তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহারাও অনেকটা উদাসীনতা ও উপেক্ষার ভাব দেখাইতেছেন। পোনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ চোখ রাঙাইয়াছিলেন, এবারে এখনও সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।* এমন কি আড়াই বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য কারণে পঞ্জাবে যে নৃশংস অভিনয় হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক গুরুতর কারণ

---

*, এই প্রবন্ধ লেখার পর গভর্ণমেণ্টের ভাব অনেকটা বদলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সত্ত্বেও মালাবারে তাঁহারা সেরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেছেন না। কথায় কথায় হরতাল হইতেছে; ধর্ম্মঘট হইতেছে; চারিদিকে সরকারের প্রতাপ চক্ষের উপরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজ-পুরুষেরা অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এ সকল সহিয়া যাইতেছেন। ইহার পশ্চাতে কোন্ গূঢ় নীতি লুকাইয়া আছে, অনুমান করা নিতান্ত অসাধ্য না হইলেও, স্পষ্ট করিয়া বলা একান্ত সহজ নহে। কঠোর নীতি অবলম্বনে কোনও ফল হইবে না। বরং বিপরীত ফল হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা তাঁহারাও বোঝেন, আমরাও জানি। ও খেলা উভয়পক্ষেরই অভ্যস্ত। সুতরাং কোনও পক্ষই সহজে আবার সে খেলা খেলিতে ব্যগ্র নহেন। নতুবা ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান অসহযোগ-নাটকের অভিনয়ের একাধিক পট-পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত নিজেদের চাল চালিতেছেন, আমরা কি সেরূপ বিচক্ষণতার সহিত চলিতেছি? এই প্রশ্নটা ধীরভাবে, একাগ্রচিত্তে বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এইজন্যই বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা কি চাই?

(৫)

আমরা চাই, স্বরাজ, অর্থাৎ বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনের আমূল পরিবর্ত্তন। ইহা দেশের প্রায় সকল লোকেরই প্রাণের ভিতরকার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসন নষ্ট হইলেই কি আমরা যাহা চাই, তাহা পাইব? অথবা যে কারণে এই ইংরাজশাসন এতটা অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল কারণ নিঃশেষে দূর হইবে? ইংরাজ-শাসনের প্রধান দোষ এই যে ইহা দেশের লোকমতের বা বহুমতের অনুগত নহে। অর্থাৎ দেশের লোকের অভিমত অনুযায়ী আইন-কানুন রচিত হয় না। বিদেশেই শাসনকর্ত্তারা নিজেদের খেয়ালমত বা স্বার্থসাধনের জন্য দেশের আইন-কানুন রচনা ও শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সর্ব্বদাই যে ইহাতে প্রজার স্বার্থ হানি হয়, এমন বলা যায় না। যেখানে শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে শাসিত সাধারণের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই আমাদের স্বার্থ-হানি করিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসাধন করিতে চাহেন। ইহার ফলে আমাদের জাতির সমষ্টিগত ধনের, মানের এবং স্বাধীনতার যথাযোগ্য বৃদ্ধি ও সম্ভোগের ব্যাঘাত জন্মে। নিক্তির ওজনে বিচার করিলে বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ইহাই। রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে যাইয়া দেশের শিক্ষিত নেতৃগণের যে বুদ্ধি-বিকাশ হয়, শাসনকুশলতাসম্পাদনের জন্য শাসক-দিগকে যে সংযম ও দূরদর্শিতা সাধন করিতে হয়, দেশরক্ষার ভারবহনে যে ক্ষাত্রবীর্য্য ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থাতে আমরা এ সকল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। জগতের অপরাপর জাতিসকল যেরূপে সমষ্টিভাবে আপনাদের জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবার অবকাশ পাইয়াছে, আমাদের সে অবকাশ নাই। এ দেশের ইংরাজ-শাসনের প্রধান দোষ ইহাই। যেখানেই একটা ভিন্ন দেশের ও ভিন্নজাতির লোকে কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়া বসে ও আর একটা দেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার-গ্রহণ করে, সেখানেই এরূপ অবিচার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভারতের ইংরাজশাসনের এই মারাত্মক অপকারিতা অস্বীকার করা যায় না।

(৬)

কিন্তু জাতিগতভাবে, সমষ্টিরূপে এই শাসনের অধীনে আমরা যেরূপ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে ঠিক ততটা পরিমাণে পঙ্গু হইয়াছি কি? একথাটাও একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। জাতির সঙ্গে ব্যক্তির, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী, ইংরেজিতে যাহাকে অর্গেনিক (organic) সম্বন্ধ কহে। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে অঙ্গীর অনিষ্টপাতে বা পূর্ণ ও প্রমুক্ত আত্মবিকাশের ব্যাঘাতে তাহার অঙ্গ সকলের দুর্ব্বলতা ও আত্মবিকাশের হানি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। শরীর দুর্ব্বল ও অচল হইলে, ক্রমে শরীরের ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গসকলও অপটু ও অক্ষম হইতে আরম্ভ করে। সেইরূপ যে জাতি স্বাধীনভাবে আপনার জাতীয়জীবনের সকল অঙ্গের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, সে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিরাও, তাহার ফলে, জীবনের নানাদিকে আত্মবিকাশ, আত্মপ্রকাশ ও আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। একথাটা সর্ব্বদাই দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। যতক্ষণ না ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ অন্য কোনও জাতির শক্তির বা কৌশলের প্রভাবে নিজের মনুষ্যত্ব ও জাতীয়জীবনের আদর্শ ও সাধনার সম্যক সম্প্রসারণের পথে কোনও প্রকারের বাধা না পাইয়া, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সম্পূর্ণ অবসর পাইয়াছে, ততক্ষণ ভারতের ব্যক্তিসাধারণে বা জনসাধারণে ব্যষ্টিভাবেও নিজেদের সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবে না। একথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে ও সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতেই হইবে। এই ধারণা এবং ভাবনাই স্বরাজ-সাধনের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রকে ভুলিলে চলিবে না। ইংরেজ নিজের শাসনকে যতই উদার বা মোলায়েম করুক না কেন, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের যথাযোগ্য বিকাশ ও সার্থকতালাভ যে কখনই সম্ভব হইবে না, ইহা যে ভুলিবে, তাহার বন্ধন কখনও ঘুচিবে না। কিন্তু এই কথাটা আগুণ দিয়া মনের ভিতরে অক্ষরে অক্ষরে দাগাইয়া রাখিয়াই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও সর্ব্বদাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে ইংরেজ শাসনের এই সাংঘাতিক অপকারিতা সত্ত্বেও, কোনও কোনও দিকে, এই শাসনাধীনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যতটা স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছি, এতটা পরিমাণে ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার ও অবসর পাই নাই।

(৭)

আর এখন যাঁহারা ধীরভাবে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সমক্ষে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্নই এই :—একটা অনির্দ্দিষ্ট-রূপ, অব্যাখ্যাত-অর্থ, অজ্ঞাত-লক্ষ্য "স্বরাজের" লোভে আমরা আমাদের এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে চাহি কি না? এই প্রশ্নটা উঠে এইজন্য যে এই স্বরাজের নামে, এই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে সকল কাজ হইতেছে, তাহাতে ত দেখিতে পাই যে, "শয়তানী" ইংরাজ-রাজের শাসনাধীনেও আমাদের যেটুকু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এই স্বরাজপন্থীদের শাসনে তাহাও থাকে না। ইংরেজ যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। চারিদিকে নানাভাবে আমাদিগকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত ত ইংরাজশাসনে এমন কোথাও ঘটে নাই যে বাজারে আমি দাম দিয়া, স্বাধীনভাবে আমার আহার্য্য বা ব্যবহার্য্য বস্তু কিনিতে পাই না। পাইতে হইলে